মার্কস এঙ্গেলস

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার

Karl Marx

দুনিয়ার মজুর এক হও!

কার্ল মার্কস
ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

১৯৭০

প্রকাশকের বক্তব্য

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'এর (১) এই বাংলা সংস্করণ ১৮৮৮ সালের এঙ্গেলস সম্পাদিত ইংরেজী সংস্করণের অনুবাদ।

পুস্তিকায় ১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণ ও ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের জন্য লিখিত এঙ্গেলসের টীকা সন্নিবদ্ধ হয়েছে।

'ইশতেহার'এর বিভিন্ন সংস্করণের জন্য লেখা রচয়িতাদের সমস্ত ভূমিকা এ সংস্করণে দেওয়া হল।

К. Маркс и Ф. Энгельс

МАНИФЕСТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

на языке бенгали

'প্রতিভাদীপ্ত স্পষ্টতায় ও চমৎকারিত্বে এ রচনায় মূর্ত হয়েছে নতুন বিশ্বদৃষ্টি, সমাজজীবনের এলাকা পর্যন্ত প্রসারিত সুসঙ্গত বস্তুবাদ, বিকাশের সর্বাপেক্ষা সর্বাঙ্গীন ও সুগভীর মতবাদ স্বরূপ দ্বন্দ্ববাদ, শ্রেণী-সংগ্রামের এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক ভূমিকার তত্ত্ব।'

লেনিন

সূচি

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার

১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

'কমিউনিস্ট লীগ' (২) ছিল শ্রমিকদের এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, তখনকার অবস্থা অনুসারে তার গুপ্ত সমিতি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লণ্ডনে এর যে কংগ্রেস বসে তা থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীদের উপর ভার দেওয়া হয়, পার্টির একটি বিশদ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কর্মসূচি রচনা করতে প্রকাশের জন্য। নিচের 'ইশতেহার'টির উৎপত্তি হয় এইভাবে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের* কয়েক সপ্তাহ আগে এর পাণ্ডুলিপিটি ছাপা হবার জন্য লণ্ডনে যায়। জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশের পর, জার্মানি, ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে এটি জার্মান ভাষায় অন্তত বারটি বিভিন্ন সংস্করণে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজীতে, শ্রীমতী হেলেন ম্যাকফারলেনের অনুবাদে, এর প্রথম প্রকাশ হয়েছিল লণ্ডনের *Red Republican*-এ (লাল প্রজাতন্ত্রী) ১৮৫০ সালে এবং পরে ১৮৭১ সালে আমেরিকায় অন্তত তিনটি স্বতন্ত্র অনুবাদের মাধ্যমে। ফরাসী অনুবাদ প্রথম বের হয় প্যারিসে ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুত্থানের সামান্য আগে, আবার সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে নিউ ইয়র্কের *Le Socialiste* পত্রিকায়। আরও একটি অনুবাদের কাজ এখন চলেছে। জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হবার কিছু পরেই লণ্ডনে পোলীয় অনুবাদ বের হয়েছিল। ঊনিশ শতকের সপ্তম দশকে জেনেভা শহরে প্রকাশিত হয় এর রুশ অনুবাদ। প্রথম প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যে এর অনুবাদ হয় ডেনিশ ভাষাতেও।

গত পঁচিশ বছরে বাস্তব অবস্থা যতই বদলে যাক না কেন, এই 'ইশতেহার'এ যে সব সাধারণ মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছিল তা আজও মোটের ওপর ঠিক আগের মতোই সঠিক। এখানে ওখানে সামান্য দু'একটি কথা আরও ভাল করে লেখা যেত। সর্বত্র এবং সবসময়ে মূলনীতিগুলির

* ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব। — সম্পাঃ

ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করবে তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থার উপর, 'ইশতেহার'এর ভিতরেই সে কথা রয়েছে। সেইজন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যেসব বিপ্লবী ব্যবস্থার প্রস্তাব আছে তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নি। আজকের দিনে হলে এ অংশটা নানা দিক থেকে অন্যভাবে লিখতে হত। গত পঁচিশ বছরে আধুনিক যন্ত্রশিল্প যে বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি সংগঠন উন্নত ও প্রসারিত হয়েছে; প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে, পরে আরও বেশী করে প্যারিস কমিউনে, যেখানে প্রলেতারিয়েত এই সর্বপ্রথম পুরো দুই মাস ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল, তাতে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তার ফলে এই কর্মসূচি খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপারে সেকেলে হয়ে পড়েছে। কমিউন বিশেষ করে একটি কথা প্রমাণ করেছে যে: 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটা শুধু দখলে পেয়েই শ্রমিক শ্রেণী তা নিজের কাজে লাগাতে পারে না।' ('ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ; শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের অভিভাষণ', লণ্ডন, ট্রুলাভ, ১৮৭১, ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য*; সেখানে কথাটা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) তাছাড়া এ কথাও স্বতঃস্পষ্ট যে, সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের সমালোচনাটি আজকের দিনের হিসাবে অসম্পূর্ণ, কারণ সে আলোচনার বিস্তার এখানে মাত্র ১৮৪৭ পর্যন্ত; তাছাড়া বিভিন্ন বিরোধী দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তব্যগুলিও (চতুর্থ অধ্যায়ে), সাধারণ মূলনীতির দিক থেকে ঠিক হলেও, ব্যবহারিক দিক থেকে সেকেলে হয়ে গেছে, কেননা রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেছে, এবং উল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশকে ইতিহাসের অগ্রগতি এ জগৎ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়েছে।

কিন্তু এই 'ইশতেহার' এখন ঐতিহাসিক দলিল হয়ে পড়েছে, একে বদলাবার কোনও অধিকার আমাদের আর নেই। সম্ভবত পরবর্তী কোনো সংস্করণ বার করা যাবে যাতে ১৮৪৭ থেকে আজ অবধি ব্যবধান কালটুকু নিয়ে একটা ভূমিকা থাকবে; বর্তমান সংস্করণ এত অপ্রত্যাশিতভাবে বেরল যে আমাদের পক্ষে তার সময় ছিল না।

কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২৪শে জুন, ১৮৭২

---

* কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

১৮৮২ সালের রুশ সংস্করণের ভূমিকা

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'এর প্রথম রুশ সংস্করণ, বাকুনিনের অনুবাদে, সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে* 'কলোকোল' (৩) পত্রিকার ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিন পশ্চিমের কাছে এটা ('ইশতেহার'এর রুশ সংস্করণ) মনে হতে পারত একটা সাহিত্যিক কৌতূহল-বস্তু মাত্র। আজ তেমন ভাবে দেখা অসম্ভব।

তখনো পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ১৮৪৭) প্রলেতারীয় আন্দোলন কত সীমাবদ্ধ স্থান জুড়ে ছিল সে কথা সবচেয়ে পরিষ্কার করে দেয় 'ইশতেহার'এর শেষ অধ্যায়টা: বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিরোধী দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখই নেই এখানে। সে যুগে রাশিয়া ছিল ইউরোপের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরাট শেষ-নির্ভর, আর দেশান্তরগমনের ভিতর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করছিল ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের উদ্বৃত্ত অংশটাকে। উভয় দেশই ইউরোপকে কাঁচামাল যোগাত, আর সেইসঙ্গে ছিল তার শিল্পজাত সামগ্রীর বাজার। সে যুগে তাই দুই দেশই কোনো না কোনো ভাবে ছিল ইউরোপের চলতি ব্যবস্থার স্তম্ভ।

আজ অবস্থা কত বদলে গেছে! ইউরোপ থেকে নবাগত লোকের বসতির দরুনই উত্তর আমেরিকা বৃহৎ কৃষি-উৎপাদনের যোগ্য ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, তার প্রতিযোগিতা ইউরোপের ছোট বড় সমস্ত ভূসম্পত্তির ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে। তাছাড়া এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল শিল্পসম্পদকে এমন উৎসাহভরে ও এমন আয়তনে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছে যে শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলণ্ডের যে একচেটিয়া অধিকার আজো

---

* উল্লিখিত সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। তারিখটা এঙ্গেলস ভুলভাবে দিয়েছেন। — সম্পাঃ

রয়েছে, তা অচিরে ভেঙে পড়তে বাধ্য। এ দুটি ব্যাপার আবার আমেরিকার উপরেই বিপ্লবী প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে কৃষকের ছোট ও মাঝারি ভূসম্পত্তি ছিল, তা ক্রমে ক্রমে বৃহদায়তন খামারের প্রতিযোগিতায় অভিভূত হয়ে পড়ছে; সেইসঙ্গে শিল্পাঞ্চলে এই প্রথম ঘটছে গণ প্রলেতারিয়েত ও অবিশ্বাস্য পুঁজি কেন্দ্রীভবনের বিকাশ।

তারপর রুশদেশ! ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময় শুধু ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ নয়, ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণী পর্যন্ত সদ্যজাগরণোন্মুখ প্রলেতারিয়েতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় দেখেছিল রাশিয়ার হস্তক্ষেপে। জারকে তখন ঘোষণা করা হয়েছিল ইউরোপে প্রতিক্রিয়ার প্রধান নেতা হিসাবে। সেই জার আজ বিপ্লবের কাছে গাৎচিনায় যুদ্ধবন্দীর মতন, আর ইউরোপে বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া।

আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির অনিবার্য আগতপ্রায় অবসান ঘোষণা করাই ছিল 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'এর লক্ষ্য। কিন্তু রাশিয়াতে দেখি দ্রুত বর্ধিষ্ণু পুঁজিবাদী জুয়াচুরি ও বিকাশোন্মুখ বুর্জোয়া ভূসম্পত্তির মুখামুখি রয়েছে দেশের অর্ধেকের বেশি জমি জুড়ে চাষীদের যৌথ মালিকানা। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে যে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এলেও জমির উপর মিলিত মালিকানার আদি রূপ এই রুশ অব্‌শিচনা (obshchina)* কি কমিউনিস্ট সাধারণ মালিকানার উচ্চতর পর্যায়ে সরাসরি রূপান্তরিত হতে পারে? না কি পক্ষান্তরে তাকেও যেতে হবে ভাঙনের সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যা পশ্চিমে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে?

এর একমাত্র যে উত্তর দেওয়া আজ সম্ভব তা হল এই: রাশিয়ায় বিপ্লব যদি পশ্চিমে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সংকেত হয়ে ওঠে যাতে দুই বিপ্লব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে রুশদেশে ভূমির বর্তমান যৌথ মালিকানা কাজে লাগতে পারে কমিউনিস্ট বিকাশের সূত্রপাত হিসাবে।

কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২১শে জানুয়ারি, ১৮৮২

---

* অব্‌শিচনা — গ্রামীণ সমাজ। — সম্পাঃ

১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা হায় আমাকে একলাই সই করতে হবে। ইউরোপ ও আমেরিকার সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী যাঁর কাছে সবচাইতে বেশি ঋণী সেই মার্কস হাইগেট সমাধি-ভূমিতে শান্তিলাভ করেছেন। তাঁর সমাধির উপর ইতিমধ্যেই প্রথম তৃণরাজি মাথা তুলেছে। তাঁর মৃত্যুর পর 'ইশতেহার'এ সংশোধন বা সংযোজন আরো অভাবনীয়। তাই এখানে স্পষ্টভাবে নিম্নলিখিত কথাগুলি আবার বলা আমি প্রয়োজন মনে করি:

'ইশতেহার'এর ভিতরে যে মূলচিন্তা প্রবাহমান তা হল এই: ইতিহাসের প্রতি যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং যে সমাজ-সংগঠন তা থেকে আবশ্যিকভাবে গড়ে ওঠে তা-ই থাকে সে যুগের রাজনৈতিক ও মানসিক ইতিহাসের মূলে, সুতরাং (জমির আদিম যৌথ মালিকানার অবসানের পর থেকে) সমগ্র ইতিহাস হয়ে এসেছে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের শোষিত ও শোষক, অধীনস্থ ও অধিপতি শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস; কিন্তু এই লড়াই আজ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণী (প্রলেতারিয়েত) নিজেকে শোষক ও নিপীড়ক শ্রেণীর (বুর্জোয়া) কবল থেকে উদ্ধার করতে গেলে সেইসঙ্গে গোটা সমাজকে শোষণ, নিপীড়ন ও শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি না দিয়ে পারে না — এই মূলচিন্তাটি পুরোপুরি ও একমাত্র মার্কসেরই চিন্তা*।

---

* ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় আমি লিখেছিলাম: 'ডারউইনের মতবাদ জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করেছে, আমার মতে এই সিদ্ধান্ত ইতিহাসের বেলায় তাই করতে বাধ্য। ১৮৪৫ সালের আগেকার কয়েক বছর ধরে আমরা দুজনেই ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। স্বতন্ত্রভাবে আমি কতটা এদিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তার শ্রেষ্ঠ

এ কথা আমি বহুবার বলেছি। কিন্তু ঠিক আজকেই এ বক্তব্য 'ইশতেহার'এর পুরোভাগেও রাখা প্রয়োজন।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২৮শে জুন, ১৮৮৩

নিদর্শন আমার 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইখানি। কিন্তু যখন ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রাসেল্‌স্‌ শহরে মার্কসের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল, তখন মার্কস ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্তে পেঁৗছে গিয়েছেন। এখানে আমি যে ভাষায় মূলকথাটা উপস্থিত করলাম প্রায় তেমন পরিষ্কারভাবেই তিনি তখনই তা আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন।' (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকা

মেহনতী মানুষের সংগঠন 'কমিউনিস্ট লীগ' প্রথমটা ছিল পুরোপুরি জার্মান ও পরে আন্তর্জাতিক, এবং ১৮৪৮ সালের আগেকার ইউরোপ মহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থাতে তাকে অনিবার্যভাবে হতে হয় গুপ্ত সমিতি। এই 'ইশতেহার' প্রকাশিত হয়েছিল তারই কর্মসূচি হিসাবে। ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লীগের লন্ডন কংগ্রেসে মার্কস ও এঙ্গেলসের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল একটা বিশদ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পার্টি কর্মসূচি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করতে। ১৮৪৮-এর জানুয়ারিতে জার্মানে লেখা পাণ্ডুলিপিটি ২৪শে ফেব্রুয়ারির ফরাসী বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ আগে লন্ডনে মুদ্রাকরের কাছে পাঠানো হয়। ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুত্থানের সামান্য আগে এর ফরাসী অনুবাদ প্যারিসে প্রকাশ হয়। শ্রীমতী হেলেন ম্যাকফারলেন কৃত প্রথম ইংরেজী অনুবাদ বের হয় ১৮৫০ সালে লন্ডনে জর্জ জুলিয়ান হার্নির *Red Republican* পত্রিকায়। ডেনিশ ও পোলীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার প্রথম মহাসংগ্রাম, প্যারিস অভ্যুত্থানের পরাজয় ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবিকে ফের কিছুদিনের মতো পিছনে হটিয়ে দিল। তারপর থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগেকার মতো ফের কেবল মালিক শ্রেণীর নানা অংশের মধ্যেই ক্ষমতাদখলের লড়াই চলতে থাকে; শ্রমিক শ্রেণীকে নেমে আসতে হয় রাজনৈতিক অস্তিত্বের লড়াইটুকুতে, মধ্য শ্রেণীর র‍্যাডিকাল দলের চরমপন্থী অংশ রূপে দাঁড়াতে হয় তাদের। যেখানেই স্বাধীন প্রলেতারীয় আন্দোলনে জীবনের লক্ষণ দেখা গেল, সেখানেই তাকে দমন করা হল

নির্মমভাবে। এইভাবেই সে সময়ে কলোন শহরে অবস্থিত 'কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে হানা দেয় প্রাশিয়ার পুলিশ। তার সভ্যরা গ্রেপ্তার হল এবং আঠারো মাস কারাবাসের পর ১৮৫২ সালের অক্টোবরে তাদের বিচার হয়। এই প্রসিদ্ধ 'কলোন কমিউনিস্টদের বিচার' চলেছিল ৪ঠা অক্টোবর থেকে ১২ই নভেম্বর; বন্দীদের সাতজনকে তিন থেকে ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল এক দুর্গের অভ্যন্তরে। দণ্ড ঘোষণার অব্যবহিত পরে বাকি সভ্যরা লীগ সংগঠনকে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেয়। আর 'ইশতেহার' সম্বন্ধে মনে হল যে এরপর থেকে তার ভাগ্যে বিস্মৃতির নির্বন্ধ।

ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণী যখন শাসক শ্রেণীর উপর আর একটা আক্রমণের মতো পর্যাপ্ত শক্তি ফিরে পায়, তখন আবির্ভূত হয় 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি' (International Working Men's Association)। ইউরোপ ও আমেরিকার সমগ্র জঙ্গী প্রলেতারিয়েতকে এক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংগঠিত করার বিশেষ উদ্দেশ্য থাকার দরুন এই সমিতি কিন্তু 'ইশতেহার'এ লিপিবদ্ধ মূলনীতিগুলি সরাসরি ঘোষণা করতে পারে নি। আন্তর্জাতিকের কর্মসূচি বাধ্য হয়েই এতটা উদার করতে হয় যাতে তা গ্রহণীয় হয় ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়ন, ফ্রান্স-বেলজিয়ম-ইতালি ও স্পেনের প্রুধোঁবাদী এবং জার্মান লাসালপন্থীদের* কাছে। এই কর্মসূচি মার্কস রচনা করেছিলেন এই সকল দলের সন্তোষ বিধান করে; মিলিত কাজ ও পারস্পরিক আলোচনার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধিগত যে বিকাশ ছিল সুনিশ্চিত, তার উপরেই তিনি পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন। পুঁজির সঙ্গে সংগ্রামের ঘটনা ও দুর্বিপাকেই, জয়লাভের চাইতেও পরাজয়ে শ্রমিকদের এই জ্ঞানোদয় না হয়ে পারে নি যে তাদের সাধের নানা টোটকাগুলি (nostrums) অপর্যাপ্ত, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির আসল শর্ত সম্বন্ধে পূর্ণতর অন্তর্দৃষ্টির পথ না কেটে পারে নি। মার্কস ঠিকই বুঝেছিলেন। ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক সৃষ্টির সময় শ্রমিকেরা যে অবস্থায় ছিল তা থেকে একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে তারা বেরিয়ে

---

* লাসাল আমাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই স্বীকার করতেন যে তিনি মার্কসের শিষ্য এবং সেই হিসাবে 'ইশতেহারের' উপরেই তাঁর ভিত্তি। কিন্তু ১৮৬২—১৮৬৪ সালের প্রকাশ্য আন্দোলনে তিনি রাষ্ট্রের ক্রেডিটের সাহায্যে উৎপাদক সমবায়ের দাবির বেশি অগ্রসর হন নি। (এঙ্গেলসের টীকা)

আসে ১৮৭৪ সালে আন্তর্জাতিক ভেঙে যাবার সময়। ফ্রান্সে প্রুধোঁবাদ, জার্মানিতে লাসালপন্থা তখন মুমূর্ষু; এমন কি রক্ষণশীল ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নগুলিও, তাদের অধিকাংশ বহুদিন যাবৎ আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকলেও, ধীরে ধীরে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে যে গত বছর সোয়ান্সি শহরে তাদের সভাপতি তাদের নামেই ঘোষণা করতে পারলেন: 'ইউরোপীয় ভূখণ্ডের সমাজতন্ত্র আমাদের কাছে আর বিভীষিকা নেই।' বস্তুত, সকল দেশের মেহনতী মানুষের মধ্যে 'ইশতেহারের' নীতিগুলি অনেক পরিমাণে ছড়িয়েছে।

তাই 'ইশতেহার' আবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৮৫০ সালের পর তার মূল জার্মান পাঠ কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে সুইজারল্যান্ড, ইংলন্ড ও আমেরিকাতে। ১৮৭২ সালে নিউ ইয়র্কে ইংরেজী অনুবাদ হয়েছিল, অনুবাদটি সেখানকার *Woodhull and Claflin's Weekly*-তে প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজী পাঠ থেকে একটা ফরাসী অনুবাদ হয় নিউ ইয়র্কের *Le Socialiste* পত্রিকায়। এরপর কিছুটা বিকৃতি সহ অন্তত আরও দুটি ইংরেজী অনুবাদ আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ইংলন্ডে। প্রথম রুশ অনুবাদ বাকুনিনের করা, সেটি জেনেভা শহরে গের্ৎসেনের 'কলোকোল' অফিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ আন্দাজ; দ্বিতীয় অনুবাদ করেন বীরনারী ভেরা জাসুলিচ*, তা বের হয় ১৮৮২ সালে জেনেভাতেই। এক নতুন ডেনিশ সংস্করণ পাওয়া যাবে কোপেনহাগেনে ১৮৮৫ সালের *Social-demokratisk Bibliothek*-এ; নতুন এক ফরাসী অনুবাদ আছে প্যারিসে ১৮৮৫ সালের *Le Socialiste* পত্রিকায়। শেষেরটি অনুসরণে একটা স্পেনীয় অনুবাদ মাদ্রিদে ১৮৮৬ সালে প্রস্তুত ও প্রকাশিত হয়। জার্মান পুনর্মুদ্রণের সংখ্যা অশেষ, খুব কম করেও অন্তত বারো। কয়েক মাস আগে কন্স্ট্যান্টিনোপলে থেকে একটা আর্মেনিয়ান অনুবাদের কথা ছিল, কিন্তু তা প্রকাশিত হয় নি শুনেছি এই জন্য যে প্রকাশক মার্কসের নামাঙ্কিত বই বের করতে সাহস পান নি আর অনুবাদক লেখাটা নিজের বলে প্রচার করতে গররাজী হন। অন্যান্য ভাষায় আরও অনুবাদের কথা আমি শুনেছি

---

* অনুবাদ করেছিলেন গ. ভ. প্লেখানভ; স্বয়ং এঙ্গেলস পরে *Internationales aus dem Volksstaat (1871-75)*, বার্লিন ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'রাশিয়ায় সামাজিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের পুনশ্চ অংশে কথাটা লিখে গেছেন। — সম্পাঃ

কিন্তু নিজের চোখে দেখি নি। সুতরাং 'ইশতেহারের' ইতিহাস অনেকাংশে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসই প্রতিফলিত করছে; আজকের দিনে সমগ্র সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের সবচেয়ে প্রচারিত, সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সাহিত্য-কীর্তি এইটেই; সাইবেরিয়া থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষ একে মেনে নিয়েছে নিজেদের সাধারণ কর্মসূচি হিসাবে।

কিন্তু লেখার সময়ে একে **সমাজতন্ত্রী** ইশতেহার বলা সম্ভব ছিল না। ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্রী নামে বোঝাত একদিকে বিভিন্ন ইউটোপীয় মতবাদের অনুগামীদের: যেমন ইংলণ্ডে ওয়েন-পন্থী, ফ্রান্সে ফুরিয়ে-পন্থীরা, উভয়েই তখন সংকীর্ণ গোষ্ঠীর পর্যায়ে নেমে গিয়ে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল; অন্যদিকে বোঝাত অতি বিচিত্র সব সামাজিক হাতুড়েদের, এরা নানাবিধ তুকতাকে পুঁজি ও মুনাফার কোনও ক্ষতি না করে সর্বপ্রকার সামাজিক অভিযোগের প্রতীকার করার প্রতিশ্রুতি দিত। উভয় ক্ষেত্রের লোকেরাই ছিল শ্রমিক আন্দোলনের বাইরে, উভয়েরই চোখ ছিল 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের সমর্থনের দিকেই। শ্রমিক শ্রেণীর যেটুকু অংশ নিতান্ত রাজনৈতিক বিপ্লবের অপর্যাপ্ততা বুঝেছিল, সমাজের সম্পূর্ণ বদলের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেছিল, সেই অংশ তখন নিজেদের কমিউনিস্ট নামে পরিচয় দিত। অবশ্য এ ছিল একটা কাঁচা, অমার্জিত, নিতান্তই সহজবোধের কমিউনিজম; তবু এতে মূলকথাটা ধরা পড়েছিল এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এর এতটা প্রভাব ছিল যে এ থেকে জন্ম নেয় ফ্রান্সে কাবে-র ও জার্মানিতে ভাইতলিং-এর ইউটোপীয় কমিউনিজম। তাই ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্র ছিল বুর্জোয়া আন্দোলন আর কমিউনিজম শ্রমিক শ্রেণীর। অন্তত ইউরোপ মহাদেশে সমাজতন্ত্র ছিল 'ভদ্রস্থ', আর কমিউনিজম ছিল ঠিক তার বিপরীত। আর প্রথম থেকেই যেহেতু আমাদের ধারণা ছিল যে 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হওয়া চাই শ্রমিক শ্রেণীরই নিজস্ব কাজ', তাই দুই নামের মধ্যে কোনটা আমরা নেব সে সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না। তাছাড়া আজ পর্যন্ত আমরা এ নাম বর্জন করার দিকেও যাই নি।

যদিও 'ইশতেহার' আমাদের দুজনের রচনা, তবু আমার মনে হয় আমার বলা উচিত যে, এর মূলে রয়েছে যে-প্রধান বক্তব্য সেটা মার্কসেরই নিজস্ব। সে বক্তব্য হল এই: ইতিহাসের প্রতি যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বিনিময়ের প্রধান পদ্ধতি এবং তার আবশ্যিক ফল যে সামাজিক সংগঠন তাই

হল একটা ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে সে যুগের রাজনৈতিক ও মানসিক ইতিহাস এবং একমাত্র তা দিয়েই এ ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা চলে; সুতরাং মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস (জমির উপর যৌথ মালিকানা সম্বলিত আদিম উপজাতীয় সমাজের অবসানের পর থেকে) হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, শোষক এবং শোষিত, শাসক এবং নিপীড়িত শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস; শ্রেণী-সংগ্রামের এই ইতিহাস হল বিবর্তনের এক ধারা যা আজকের দিনে এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যেখানে একই সঙ্গে গোটা সমাজকে সকল শোষণ, নিপীড়ন, শ্রেণী-পার্থক্য ও শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি না দিয়ে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণীটি — অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত — শোষক ও শাসকের, অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্বের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।

ডারউইনের মতবাদ জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করেছে, আমার মতে এই সিদ্ধান্ত ইতিহাসের বেলায় তাই করতে বাধ্য। ১৮৪৫ সালের আগেকার কয়েক বছর ধরে আমরা দুজনেই ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। স্বতন্ত্রভাবে আমি কতটা এদিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমার 'ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইখানি*। কিন্তু যখন ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রাসেল্স্ শহরে মার্কসের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল, তখন মার্কস ইতিমধ্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছেন। এখানে আমি যে ভাষায় মূলকথাটা উপস্থিত করলাম প্রায় তেমন পরিষ্কারভাবেই তিনি তখনই তা আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন।

১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণে আমাদের মিলিত ভূমিকা থেকে নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করছি:

'গত পঁচিশ বছরে বাস্তব অবস্থা যতই বদলে যাক না কেন, এই 'ইশতেহার'এ যে সব সাধারণ মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছিল তা আজও মোটের ওপর ঠিক আগের মতোই সঠিক। এখানে ওখানে সামান্য দু'একটি কথা আরও ভাল করে লেখা যেত। সর্বত্র এবং সবসময় মূলনীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করবে তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থার উপর, 'ইশতেহার'এর

* *"The Condition of the Working Class in England in 1844"*. By Frederick Engels. Translated by Florence K. Wishnewetzky, New York, Lovell–London. W. Reeves, 1888. (এঙ্গেলসের টীকা।)

ভিতরেই সে কথা রয়েছে। সেইজন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যেসব বিপ্লবী ব্যবস্থার প্রস্তাব আছে তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নি। আজকের দিনে হলে এ অংশটা নানা দিক থেকে অন্যভাবে লিখতে হত। ১৮৪৮-এর পর থেকে আধুনিক যন্ত্রশিল্প যে বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি সংগঠন উন্নত ও প্রসারিত হয়েছে, প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে, পরে আরও বেশী করে প্যারিস কমিউনে, যেখানে প্রলেতারিয়েত এই সর্বপ্রথম পুরো দুই মাস ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল, তাতে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তার ফলে এই কর্মসূচি খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপারে সেকেলে হয়ে পড়েছে। কমিউন বিশেষ করে একটা কথা প্রমাণ করেছে যে: 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটা শুধু দখলে পেয়েই শ্রমিক শ্রেণী তা নিজের কাজে লাগাতে পারে না।' ('ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ; শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের অভিভাষণ', লন্ডন, ট্রুলাভ, ১৮৭১, ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য*; সেখানে কথাটা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) তাছাড়া এ কথাও স্বতঃস্পষ্ট যে, সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের সমালোচনাটি আজকের দিনের হিসাবে অসম্পূর্ণ, কারণ সে আলোচনার বিস্তার এখানে মাত্র ১৮৪৭ পর্যন্ত; তাছাড়া বিভিন্ন বিরোধী দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তব্যগুলিও (চতুর্থ অধ্যায়ে), সাধারণ মূলনীতির দিক থেকে ঠিক হলেও, ব্যবহারিক দিক থেকে সেকেলে হয়ে গেছে, কেননা রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেছে, এবং উল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশকে ইতিহাসের অগ্রগতি এ জগৎ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়েছে।

'কিন্তু এই 'ইশতেহার' এখন ঐতিহাসিক দলিল হয়ে পড়েছে, একে বদলাবার কোনও অধিকার আমাদের আর নেই।'

মার্কসের 'পুঁজি' বইটির বেশির ভাগটার অনুবাদক, মিঃ স্যামুয়েল মুর এই অনুবাদ করেছেন। আমরা দুজনে মিলে এর সংশোধন করেছি; কয়েকটি ঐতিহাসিক উল্লেখের ব্যাখ্যা হিসাবে কিছু টীকা আমি সংযোজন করেছি।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লন্ডন, ৩০শে জানুয়ারি, ১৮৮৮

---

* কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

ওপরের কথাগুলো* লেখার পর 'ইশতেহারের' একটি নতুন জার্মান সংস্করণের প্রয়োজন হয়েছে এবং 'ইশতেহারের' ক্ষেত্রে অনেক কিছু ঘটেছে যার উল্লেখ করা উচিত।

ভেরা জাসুলিচ অনূদিত একটি দ্বিতীয় রুশ সংস্করণ ১৮৮২ সালে জেনেভায় প্রকাশিত হয়েছে; এ সংস্করণের ভূমিকা মার্কস ও আমি লিখেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত মূল জার্মান পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গেছে; তাই রুশ থেকে তা ফের অনুবাদ করে দিচ্ছি, মূল পাঠ থেকে তা বিশেষ অন্যতর হবে না। ** ভূমিকাটি এই:

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'এর প্রথম রুশ সংস্করণ, বাকুনিনের অনুবাদে, সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে 'কলোকোল' পত্রিকার ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিন পশ্চিমের কাছে এটা ('ইশতেহার'এর **রুশ** সংস্করণ) মনে হতে পারত একটা সাহিত্যিক কৌতূহল-বস্তু মাত্র। আজ তেমন ভাবে দেখা অসম্ভব।

'তখনো পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ১৮৪৭) প্রলেতারীয় আন্দোলন কত সীমাবদ্ধ স্থান জুড়ে ছিল সে কথা সবচেয়ে পরিষ্কার করে দেয় 'ইশতেহার'এর শেষ অধ্যায়টা: বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিরোধী দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখই নেই এখানে। সে যুগে রাশিয়া ছিল ইউরোপের

---

* ১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণের তাঁর ভূমিকার কথা বলছেন এঙ্গেলস। — সম্পাঃ

** 'ইশতেহারের' রুশ সংস্করণের জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখা ভূমিকার হারিয়ে যাওয়া জার্মান পাণ্ডুলিপিটি খুঁজে পাওয়া গেছে ও মস্কোর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউটের মহাফেজখানায় তা রক্ষিত হয়েছে। — সম্পাঃ

সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরাট শেষ-নির্ভর, আর দেশান্তরগমনের ভিতর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করছিল ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের উদ্বৃত্ত অংশটাকে। উভয় দেশই ইউরোপকে কাঁচামাল যোগাত, আর সেইসঙ্গে ছিল তার শিল্পজাত সামগ্রীর বাজার। সে যুগে তাই দুই দেশই কোন না কোন ভাবে ছিল ইউরোপের চলতি ব্যবস্থার স্তম্ভ।

'আজ অবস্থা কত বদলে গেছে! ইউরোপ থেকে নবাগত লোকের বসতির দরুনই উত্তর আমেরিকা বৃহৎ কৃষি-উৎপাদনের যোগ্য ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, তার প্রতিযোগিতা ইউরোপের ছোট বড় সমস্ত ভূসম্পত্তির ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে। তাছাড়া এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল শিল্পসম্পদকে এমন উৎসাহভরে ও এমন আয়তনে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছে যে শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলন্ডের যে একচেটিয়া অধিকার আজো রয়েছে, তা অচিরে ভেঙে পড়তে বাধ্য। এ দুটি ব্যাপার আবার আমেরিকার উপরেই বিপ্লবী প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে কৃষকের ছোট ও মাঝারি ভূসম্পত্তি ছিল, তা ক্রমে ক্রমে বৃহদায়তন খামারের প্রতিযোগিতায় অভিভূত হয়ে পড়ছে; সেইসঙ্গে শিল্পাঞ্চলে এই প্রথম ঘটছে গণ প্রলেতারিয়েত ও অবিশ্বাস্য পুঁজি কেন্দ্রীভবনের বিকাশ।

'তারপর রুশদেশ! ১৮৪৮ — ১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময় শুধু ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ নয়, ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণী পর্যন্ত সদ্যজাগরণোন্মুখ প্রলেতারিয়েতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় দেখেছিল রাশিয়ার হস্তক্ষেপে। জারকে তখন ঘোষণা করা হয়েছিল ইউরোপে প্রতিক্রিয়ার প্রধান নেতা হিসাবে। সেই জার আজ বিপ্লবের কাছে গাৎচিনায় যুদ্ধবন্দীর মতন, আর ইউরোপে বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া।

'আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির অনিবার্য আগতপ্রায় অবসান ঘোষণা করাই ছিল 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'এর লক্ষ্য। কিন্তু রাশিয়াতে দেখি দ্রুত বর্ধিষ্ণু পুঁজিবাদী জুয়াচুরি ও বিকাশোন্মুখ বুর্জোয়া ভূসম্পত্তির মুখামুখি রয়েছে দেশের অর্ধেকের বেশি জমি জুড়ে চাষীদের যৌথ মালিকানা। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে যে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এলেও জমির উপর মিলিত মালিকানার আদি রূপ এই রুশ অব্‌শ্চিনা (obshchina) কি কমিউনিস্ট সাধারণ মালিকানার উচ্চতর পর্যায়ে সরাসরি রূপান্তরিত হতে পারে? না কি পক্ষান্তরে তাকেও

যেতে হবে ভাঙনের সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যা পশ্চিমে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে?

'এর একমাত্র যে উত্তর দেওয়া আজ সম্ভব তা হল এই: রাশিয়ায় বিপ্লব যদি পশ্চিমে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সংকেত হয়ে ওঠে যাতে দুই বিপ্লব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে রুশদেশে ভূমির বর্তমান যৌথ মালিকানা কাজে লাগতে পারে কমিউনিস্ট বিকাশের সূত্রপাত হিসাবে।

কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লন্ডন, ২১শে জানুয়ারি, ১৮৮২'

প্রায় একই সময়ে জেনেভায় প্রকাশিত হয় একটি পোলীয় সংস্করণ: *Manifest Komunistyczny.*

তাছাড়া *Social-demokratisk Bibliothek,* Kjöbenhavn 1885, থেকেও একটি নতুন ডেনিশ সংস্করণ বেরিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত এটি খুব সুসম্পূর্ণ নয়; অনুবাদকের কাছে সম্ভবত দুরূহ বোধ হওয়ায় কতকগুলি জরুরী অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তাছাড়া স্থানে স্থানে অযত্নের লক্ষণ আছে; সেটা চোখে লাগে আরো বেশি এই কারণে যে অনুবাদ থেকে বোঝা যায়, অনুবাদক আর একটু কষ্ট করলে চমৎকার কাজ করতে পারতেন।

১৮৮৫ সালে প্যারিসের *Le Socialiste*-এ প্রকাশিত হয়েছে একটি নতুন ফরাসী অনুবাদ; আজ পর্যন্ত এইটেই সেরা সংস্করণ।

এই ফরাসী থেকে একটি স্পেনীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয় ঐ বছরেই; প্রথমে মাদ্রিদের *El Socialista*-তে, পরে পুস্তিকাকারে: *Manifesto del Partido Comunista* por Carlos Marx y F. Engels, Madrid, Administración de *El Socialista,* Hernán Cortés 8।

একটা মজার ব্যাপার হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আর্মেনিয়ান অনুবাদের একটি পাণ্ডুলিপি দেওয়া হয়েছিল কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপল-এর একটি প্রকাশকের কাছে কিন্তু মার্কসের নামাঙ্কিত কোনো কিছু প্রকাশের সাহস এই সুবোধ ব্যক্তিটির হয় নি, তিনি বলেন লেখক হিসাবে অনুবাদকের নামটাই দেওয়া হোক, অনুবাদক কিন্তু তাতে আপত্তি করেন।

ইংলন্ড থেকে প্রথমে একটি ও পরে আর একটি ন্যূনাধিক অযথার্থ

আমেরিকান অনুবাদের বারম্বার সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর অবশেষে ১৮৮৮ সালে একটি প্রামাণ্য অনুবাদ বেরিয়েছে। অনুবাদ করেন আমার বন্ধু স্যামুয়েল মুর এবং প্রেসে পাঠাবার আগে আমরা দুজনে মিলে তা দেখে দিই। নাম দেওয়া হয়: Manifesto of the Communist Party, by Karl Marx and Frederick Engels. Authorised English Translation, edited and annotated by Frederick Engels. 1888. London, William Reeves, 185 Fleet st., E.C. তার কতকগুলি টীকা আমি বর্তমান সংস্করণটিতেও যোগ করেছি।

'ইশতেহারের' একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। সংখ্যায় তখন পর্যন্ত বেশি নয়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের এহেন অগ্রণীদের কাছ থেকে এর প্রকাশকালে জুটেছিল সোৎসাহ অভ্যর্থনা (প্রথম ভূমিকায় উল্লিখিত অনুবাদগুলিই তার প্রমাণ), কিন্তু ১৮৪৮ সালের জুনে প্যারিস শ্রমিকদের পরাজয়ের পর যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তার চাপে বাধ্য হয়ে একে পশ্চাদপসারণ করতে হল; এবং ১৮৫২ সালের নভেম্বরে কলোন কমিউনিস্টদের দণ্ডাজ্ঞার পর শেষপর্যন্ত 'আইন অনুসারে' তাকে আইন বহির্ভূত করা হয়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব থেকে যে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল, লোকচক্ষু থেকে তার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে 'ইশতেহার'ও অন্তরালে যায়।

শাসক শ্রেণীদের ক্ষমতার উপর নতুন আক্রমণের পক্ষে পর্যাপ্ত শক্তি যখন ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণী আবার সংগ্রহ করতে পারল তখন 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির' উদয় হয়। তার লক্ষ্য ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার গোটা জঙ্গী শ্রমিক শ্রেণীকে **একটি** বিরাট বাহিনীতে সুসংহত করা। সুতরাং 'ইশতেহারে' লিপিবদ্ধ নীতি থেকে তা **শুরু হতে** পারে না। এমন কর্মসূচি তাকে নিতে হয় যা ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়ন, ফরাসী, বেলজীয়, ইতালীয় ও স্পেনীয় প্রুধোঁবাদী এবং জার্মান লাসালপন্থীদের* কাছে যেন

---

* লাসাল আমাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই স্বীকার করতেন যে তিনি মার্কসের 'শিষ্য' এবং সেই হিসাবে 'ইশতেহারই' তাঁর মতের ভিত্তি। তাঁর যে ভক্তরা রাষ্ট্রীয় ক্রেডিটের সাহায্যে উৎপাদক সমবায় সম্বন্ধে তাঁর দাবির চেয়ে এগিয়ে যেতে চায় নি, যারা গোটা শ্রমিক শ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের সমর্থক এবং স্বাবলম্বনের সমর্থক এই দুই ভাগে ভাগ করতে চাইত, তাদের কথা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (এঙ্গেলসের টীকা।)

দরজা বন্ধ না করে। এই কর্মসূচি — আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীর মুখবন্ধ* মার্কস রচনা করলেন এমন নিপুণ হাতে যে বাকুনিন ও নৈরাজ্যবাদীরা পর্যন্ত তা স্বীকার করে। 'ইশতেহারে' বর্ণিত নীতিগুলির শেষপর্যন্ত বিজয়ী হবার ব্যাপারে মার্কস পুরোপুরি ও একান্তভাবে নির্ভর করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধিগত বিকাশের উপর, মিলিত লড়াই ও আলোচনা থেকে যার উদ্ভব অনিবার্য। পুঁজির সঙ্গে লড়াই-এর নানা ঘটনা ও বিপর্যয়, সাফল্যের চাইতে পরাজয়ই বেশি করে, সংগ্রামীদের কাছে প্রমাণ না করে পারে না যে তাদের আগেকার সর্বরোগহর দাওয়াইগুলি অকেজো, শ্রমিকদের মুক্তির সঠিক শর্তগুলির সম্যক উপলব্ধির পক্ষে তাদের মনকে তৈরি না করে পারে না। মার্কস ঠিকই বুঝেছিলেন। ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার সময়কার শ্রমিক শ্রেণীর তুলনায় ১৮৭৪ সালে আন্তর্জাতিক উঠে যাবার সময়কার শ্রমিক শ্রেণী সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে ওঠে। ল্যাটিন দেশগুলিতে প্রুধোঁবাদ ও জার্মানির স্বকীয় লাসালপন্থা তখন মরণোন্মুখ, এমন কি চরম রক্ষণশীল ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নগুলি পর্যন্ত ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিল এমন একটা পর্যায়ে যখন ১৮৮৭ সালে তাদের সোয়ানসি কংগ্রেসের সভাপতি তাদের তরফ থেকে বলতে পারলেন যে: 'ইউরোপীয় ভূখণ্ডের সমাজতন্ত্র আমাদের কাছে আর বিভীষিকা নেই।' অথচ ১৮৮৭ সালের ইউরোপীয় ভূখণ্ডের সমাজতন্ত্র প্রায় পুরোপুরিই 'ইশতেহারে' ঘোষিত তত্ত্ব মাত্র। সুতরাং কিছুটা পরিমাণে 'ইশতেহারের' ইতিহাসে ১৮৪৮ সালের পরবর্তী আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসটাই প্রতিফলিত। বর্তমানে সমগ্র সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহেই সবচেয়ে বেশি প্রচারিত, সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সৃষ্টি, সাইবেরিয়া থেকে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত সকল দেশে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সাধারণ কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছে তা।

তবুও প্রথম প্রকাশের সময় আমরা একে **সমাজতন্ত্রী** ইশতেহার বলতে পারতাম না। ১৮৪৭ সালে দুই ধরনের লোককে সমাজতন্ত্রী গণ্য করা হত। একদিকে ছিল বিভিন্ন ইউটোপীয় মতবাদের সমর্থকেরা, বিশেষ করে ইংলণ্ডে

---

* কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

ওয়েন-পন্থী ও ফ্রান্সে ফুরিয়ে-পন্থীরা, অবশ্য ততদিনে উভয়েই সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল। অন্যদিকে ছিল অশেষ প্রকারের সামাজিক হাতুড়ে যারা সামাজিক অবিচার দূর করতে চাইত নানাবিধ সর্বরোগহর দাওয়াই ও জোড়াতালি প্রয়োগ করে—পুঁজি ও মুনাফার বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে। উভয় ক্ষেত্রেই এরা ছিল শ্রমিক আন্দোলনের বাইরের লোক এবং সমর্থনের জন্য তাকিয়ে ছিল বরং 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের দিকে। নিতান্ত রাজনৈতিক বিপ্লব যথেষ্ট নয় এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর যে অংশটি সেদিন সমাজের আমূল পুনর্গঠনের দাবি তোলে, তারা সে সময় নিজেদের **কমিউনিস্ট** বলত। তখন পর্যন্ত এটা ছিল অমার্জিত, নিতান্ত সহজবোধের, প্রায়শই অনেকটা স্থূল কমিউনিজম মাত্র। তবুও ইউটোপীয় কমিউনিজমের দুটি ধারাকে জন্ম দেবার মতো শক্তি এর ছিল — ফ্রান্সে কাবে-র 'আইকেরীয়' (Icarian) কমিউনিজম এবং জার্মানিতে ভাইতলিং-এর কমিউনিজম। ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্র বলতে বোঝাত একটা বুর্জোয়া আন্দোলন, কমিউনিজম বোঝাত শ্রমিক আন্দোলন। ইউরোপীয় ভূখণ্ডে অন্তত তখন সমাজতন্ত্র ছিল বেশ ভদ্রস্থ, আর কমিউনিজম ছিল ঠিক তার বিপরীত। ততদিন আগেই যেহেতু আমাদের অতি দৃঢ় মত ছিল যে, 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হওয়া চাই শ্রমিক শ্রেণীরই নিজস্ব কাজ', তাই দুই নামের মধ্যে কোনটি বেছে নেব সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও দ্বিধা ছিল না। পরেও কখনো নাম বর্জন করার কথা আমাদের মনে আসে নি।

'দুনিয়ার মজুর এক হও!' বেয়াল্লিশ বছর আগে, প্রথম যে প্যারিস বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত তার নিজস্ব দাবি নিয়ে হাজির হয় ঠিক তারই পূর্বক্ষণে আমরা যখন পৃথিবীর সামনে এই কথা ঘোষণা করেছিলাম, সেদিন অতি অল্প কণ্ঠেই তার প্রতিধ্বনি উঠেছিল। ১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশের শ্রমিকেরা 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিতে' হাত মেলায়, এ সমিতির স্মৃতি অতি গৌরবজনক। সত্য কথা, আন্তর্জাতিক বেঁচে ছিল মাত্র নয় বছর। কিন্তু সকল দেশের শ্রমিকদের যে চিরন্তন ঐক্য এতে সৃষ্টি হয়েছিল, সে ঐক্য যে আজও জীবন্ত এবং আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, বর্তমান কালটাই তার সর্বোত্তম সাক্ষ্য। কেননা ঠিক আজকের দিনে যখন আমি এই পঙক্তিগুলি লিখছি তখন ইউরোপ ও আমেরিকার প্রলেতারিয়েত তাদের লড়বার শক্তি বিচার করে

দেখছে, এই সর্বপ্রথম তারা সংঘবদ্ধ, সংঘবদ্ধ **একক** বাহিনী রূপে, **এক** পতাকার নিচে, **একটি** উপস্থিত লক্ষ্য নিয়ে: ১৮৬৬ সালে আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে ও আবার ১৮৮৯ সালে প্যারিস শ্রমিক কংগ্রেসে যা ঘোষিত হয়েছিল সেইভাবে আইন পাশ করে সাধারণ আট ঘণ্টা শ্রমদিন চালু করতে হবে। আজকের দিনের দৃশ্য সকল দেশের পুঁজিপতি ও জমিদারদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে আজ সকল দেশের শ্রমিকেরা সত্যই এক হয়েছে।

নিজের চোখে তা দেখবার জন্য মার্কস যদি এখনও আমার পাশে থাকতেন!

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১লা মে, ১৮৯০

১৮৯২ সালের পোলীয় সংস্করণের ভূমিকা

'কমিউনিস্ট ইশতেহারের' একটি নতুন পোলীয় সংস্করণের যে প্রয়োজন হল তাতে নানা কথা মনে আসে।

প্রথমত, 'ইশতেহারটি' যেন ইদানীং ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বৃহদায়তন শিল্প বিকাশের একটা সূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক একটি দেশে বৃহদায়তন শিল্প যে পরিমাণে বাড়ে, সেই পরিমাণেই মালিক শ্রেণীগুলির তুলনায় শ্রমিক শ্রেণী হিসাবে স্বীয় অবস্থিতির জ্ঞানলাভের জন্য সে দেশের শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে; তাদের মধ্যে প্রসার লাভ করে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও 'ইশতেহারের' চাহিদা বাড়ে। তাই শুধু শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা নয়, প্রতি দেশে বৃহদায়তন শিল্প বিকাশের মাত্রাও বেশ সঠিকভাবে মাপা যায় সে দেশের ভাষায় 'ইশতেহারের' কত কপি বিক্রি হয়েছে তা দেখে।

সেই হিসাবে নতুন পোলীয় সংস্করণটি থেকে পোলীয় শিল্পের একটি নিশ্চিত অগ্রগতির সূচনা মিলছে। দশ বছর আগের সংস্করণটি প্রকাশিত হবার পর যে এই প্রগতি সত্যই ঘটেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। রুশী পোল্যান্ড, কংগ্রেসী পোল্যান্ড* হয়ে উঠেছে রুশ সাম্রাজ্যের বৃহৎ শিল্পাঞ্চল। রুশ বৃহদায়তন শিল্প খাপছাড়াভাবে ছড়ানো — ফিনল্যান্ড উপসাগরের পাশে একটা অংশ, আর একটা অংশ মধ্যাঞ্চলে (মস্কো ও ভ্লাদিমির), তৃতীয় অংশটা কৃষ্ণ সাগর ও আজভ সাগরের উপকূলে, আরো

---

* ভিয়েনা কংগ্রেসের (১৮১৪—১৮১৫) সিদ্ধান্ত অনুসারে পোল্যান্ডের যে অংশ রাশিয়ার কাছে যায়, তার কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

কিছু অংশ অন্যত্র — কিন্তু পোলীয় শিল্প অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটা অঞ্চলে জমাট-বাঁধা এবং এরূপ কেন্দ্রীভবনের সুবিধা ও অসুবিধা দুইয়েরই ফলভোগী। পোলীয়দের রুশীতে পরিণত করার ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও রুশী কারখানামালিকেরা যখন পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রক্ষণমূলক শুল্কের দাবি জানায় তখন তারা ঐ সুবিধার কথাটাই মানে। অসুবিধাটা পোলীয় কারখানামালিক ও রুশ সরকার উভয়ের পক্ষেই প্রকাশ পায় পোলীয় শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবনার দ্রুত প্রসারে ও 'ইশতেহারের' ক্রমবর্ধমান চাহিদায়।

কিন্তু রাশিয়াকে ছাড়িয়ে গিয়ে পোলীয় শিল্পের এই যে দ্রুত বিকাশ, সেটাই আবার পোলীয় জনগণের অফুরন্ত প্রাণশক্তির নতুন সাক্ষ্য এবং তার আসন্ন জাতীয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার নতুন গ্যারাণ্টি। এবং স্বাধীন শক্তিশালী পোল্যাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় শুধু পোলীয়দের স্বার্থ নয়, আমাদের সকলেরই স্বার্থ। ইউরোপীয় জাতিগুলির একটা সাঁচ্চা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্ভব হতে পারে কেবল যদি এই প্রত্যেকটা জাতির স্বদেশে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন থাকে। ১৮৪৮ সালের যে বিপ্লবে প্রলেতারীয় পতাকা তুলেও শেষ পর্যন্ত শুধু বুর্জোয়ার কাজটা করতে হয় প্রলেতারিয়েত যোদ্ধাদের, তাতেও ইতালি, জার্মানি ও হাঙ্গেরির স্বাধীনতা অর্জিত হয় তার দায়ভাগী ব্যবস্থাপক লুই বোনাপার্ত ও বিসমার্ক মারফত। কিন্তু ১৭৯২ সালের পর থেকে একা পোল্যান্ড এই তিনটে দেশের চাইতেও বিপ্লবের জন্য অনেক বেশি কিছু করলেও ১৮৬৩ সালে তার দশগুণ শক্তিশালী রুশী শক্তির কাছে হার মানবার সময় শুধু নিজের সম্পদের ওপরেই ভরসা করতে হয় তাকে। অভিজাত সম্প্রদায় পোলীয় স্বাধীনতা বজায় রাখতেও পারত না, পুনরুদ্ধার করতেও পারত না; আজকে বুর্জোয়ার কাছে এ স্বাধীনতা, কম করে বললেও, তাৎপর্যহীন। তথাপি ইউরোপীয় জাতিগুলির সুসম সহযোগিতার জন্য তার প্রয়োজন আছে। তা অর্জন করতে পারে কেবল নবীন পোলীয় প্রলেতারিয়েত এবং তার হাতেই এ স্বাধীনতা নিরাপদ। ইউরোপের বাকী অংশের শ্রমিকদের পক্ষে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা খোদ পোলীয় শ্রমিকদের মতোই প্রয়োজনীয়।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২

১৮৯৩ সালের ইতালীয় সংস্করণের ভূমিকা

ইতালীয় পাঠকদের প্রতি

বলা যেতে পারে যে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালের ১৮ই মার্চের সঙ্গে সঙ্গে — মিলানে ও বার্লিনে বিপ্লব ঘটে এই তারিখটায় — ইউরোপীয় ভূখণ্ডের মধ্যস্থলের একটি, এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যস্থলে একটি, এই দুই জাতির সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছিল তা, এবং তা এমন দুটি জাতি যা বিভাগ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে তখনো পর্যন্ত দুর্বল হয়ে ছিল এবং সেই কারণে বৈদেশিক প্রভুত্বের অধীনস্থ হয়। ইতালি ছিল অস্ট্রীয় সম্রাটের অধীন, আর জার্মানি বহন করত অনেক অপ্রত্যক্ষ হলেও সর্বরুশীয় জারের সমান কার্যকরী জোয়াল। ১৮৪৮ সালের ১৮ই মার্চের ফলাফলে ইতালি ও জার্মানি উভয়েই এ লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পায়; ১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে এ দুটি মহা জাতি যদি পুনর্গঠিত হয়ে কিছুটা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরে থাকে, তবে তার কারণ, কার্ল মার্কস যা বলতেন, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবকে যারা দমন করে তারাই কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছিল তার দায়ভাগী ব্যবস্থাপক।

সর্বত্রই এ বিপ্লব ছিল শ্রমিক শ্রেণীর কাজ: এরাই ব্যারিকেড গড়ে, রক্ত ঢেলে মূল্য দেয়। সরকার উচ্ছেদের সময় বুর্জোয়া আমলকেও উচ্ছেদ করার সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় ছিল কেবল প্যারিস শ্রমিকদের। কিন্তু স্বশ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর মারাত্মক বৈরিতার বিষয়ে তারা সচেতন থাকলেও দেশের

অর্থনৈতিক অগ্রগতি অথবা ফরাসী শ্রমিক সাধারণের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সে পর্যায়ে পৌঁছয় নি যাতে একটা সামাজিক পুনর্গঠন সম্ভব হয়। তাই শেষ বিচারে, বিপ্লবের সুফল নেয় পুঁজিপতি শ্রেণী। অন্যান্য দেশে, ইতালিতে জার্মানিতে, অস্ট্রিয়ায় শ্রমিকেরা প্রথম থেকেই বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় বসানো ছাড়া আর কিছু করে নি। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা ছাড়া কোনো দেশেই বুর্জোয়ার শাসন সম্ভব নয়। তাই, ততদিন পর্যন্ত যেসব জাতির ঐক্য ও স্বায়ত্তশাসন ছিল না তাদের জন্য ১৮৪৮ সালের বিপ্লবকে তা এনে দিতে হয় তার পরিণতিরূপে: যথা ইতালি, জার্মানি, হাঙ্গেরি। এরপর পালা আসবে পোল্যান্ডের।

১৮৪৮ সালের বিপ্লব তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য তা রাস্তা বাঁধে, জমি তৈরি করে। সমস্ত দেশে বৃহদায়তন শিল্পকে প্রেরণা দিয়ে বুর্জোয়া আমল গত পঁয়তাল্লিশ বছরে একটা অগণিত পুঞ্জীভূত ও শক্তিশালী প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করেছে। 'ইশতেহারের' ভাষায় বলতে গেলে, তা গড়ে তুলেছে তার সমাধিখনকদের। প্রতি জাতির স্বায়ত্তশাসন ও ঐক্য পুনরুদ্ধার না করে প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক মিলন অথবা সাধারণ লক্ষ্যে এই সব জাতির শান্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত সহযোগিতা অসম্ভব হবে। ১৮৪৮ সালের আগেকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইতালীয়, হাঙ্গেরীয়, জার্মান, পোলীয় ও রুশী শ্রমিকদের মিলিত একটা আন্তর্জাতিক সংগ্রাম কল্পনা করা যায় কি!

তাই, ১৮৪৮ সালের লড়াইগুলো বৃথা লড়া হয় নি। সে বিপ্লবী যুগ থেকে আজ আমাদের যে পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যবধান তাও অযথা কাটে নি। ফল পেকে উঠছে এবং আমার এই একান্ত কামনা যে মূল 'ইশতেহার' প্রকাশ যেমন আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বিজয় সূচিত করেছিল, তার এই ইতালীয় অনুবাদ প্রকাশও যেন সেইভাবে ইতালীয় প্রলেতারিয়েতের বিজয় সূচিত করে।

অতীতে পুঁজিবাদ যে বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছিল তার প্রতি পূর্ণ সুবিচার করেছে 'ইশতেহার'। প্রথম পুঁজিবাদী দেশ ছিল ইতালি। সামন্ত মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক পুঁজিবাদী যুগের উদ্বোধন ক্ষণ চিহ্নিত এক মহাপুরুষের মূর্তিতে: তিনি ইতালীয় দান্তে, যুগপৎ তিনি মধ্যযুগের

শেষ ও আধুনিক কালের প্রথম কবি। ১৩০০ সালের মতোই আজ এক নতুন ঐতিহাসিক যুগ এগিয়ে আসছে। ইতালি কি আমাদের এক নতুন দান্তে দেবে যে সূচিত করবে এই নতুন প্রলেতারীয় যুগের জন্মলগ্ন?

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লন্ডন, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩

ইউরোপ ভূত দেখছে — কমিউনিজমের ভূত। এ ভূত ঝেড়ে ফেলার জন্য এক পবিত্র জোটের মধ্যে এসে ঢুকেছে সাবেকী ইউরোপের সকল শক্তি — পোপ এবং জার, মেত্তেরনিখ ও গিজো, ফরাসী র‍্যাডিকালেরা আর জার্মান পুলিশগোয়েন্দারা।

এমন কোন বিরোধী পার্টি আছে, ক্ষমতায় আসীন প্রতিপক্ষ যাকে কমিউনিস্ট-ভাবাপন্ন বলে নিন্দা করে নি? এমন বিরোধী পার্টিই বা কোথায় যে নিজেও আরও অগ্রসর বিরোধী দলগুলির, তথা প্রতিক্রিয়াশীল বিপক্ষদের বিরুদ্ধে পাল্টা ছুঁড়ে মারে নি কমিউনিজমের গালি?

এই তথ্য থেকে দুটি ব্যাপার বেরিয়ে আসে।

এক। ইউরোপের সকল শক্তি ইতিমধ্যেই কমিউনিজমকে একটা শক্তি হিসাবে স্বীকার করেছে।

দুই। সময় এসে গেছে যখন প্রকাশ্যে, সারা জগতের সম্মুখে কমিউনিস্টদের ঘোষণা করা উচিত তাদের মতামত কী, লক্ষ্য কী, তাদের ঝোঁক কোন দিকে, এবং কমিউনিজমের ভূতের এই আষাঢ়ে গল্পের জবাব দেওয়া উচিত পার্টির একটা ইশতেহার দিয়েই।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে নানা জাতির কমিউনিস্টরা লণ্ডনে সমবেত হয়ে নিম্নলিখিত 'ইশতেহারটি' প্রস্তুত করেছে; ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, ফ্লেমিশ এবং ডেনিশ ভাষায় এটি প্রকাশিত হবে।

১

বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত*

আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস।**

স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্লিবিয়ান, জমিদার ও

---

* বুর্জোয়া বলতে আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণী বোঝায়, যারা সামাজিক উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক এবং মজুরি-শ্রমের নিয়োগকর্তা। প্রলেতারিয়েত হল আজকালকার মজুরি-শ্রমিকেরা, উৎপাদনের উপায় নিজেদের হাতে না থাকার দরুন যারা বেঁচে থাকার জন্য স্বীয় শ্রমশক্তি বেচতে বাধ্য হয়। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

** অর্থাৎ সমগ্র **লিখিত** ইতিহাস। ১৮৪৭ সালে সমাজের প্রাগিতিহাস (pre-history), লিখিত ইতিহাসের পূর্ববর্তী কালের সামাজিক সংগঠনের বিবরণ প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। তারপরে, হাক্সথহাউজেন রুশদেশে জমির উপর যৌথ মালিকানা আবিষ্কার করেন, মাউরার প্রমাণ করেন যে, সকল টিউটনিক জাতির ইতিহাস শুরু হয় এই সামাজিক ভিত্তি থেকে, ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে ভারত থেকে আয়র্ল্যান্ড পর্যন্ত সর্বত্র গ্রাম গোষ্ঠীই (village communities) সমাজের আদি রূপ ছিল কিংবা রয়েছে। **গোত্রের** (gens) আসল প্রকৃতি এবং **উপজাতির** (tribe) সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে মর্গানের চূড়ান্ত আবিষ্কার এই আদিম কমিউনিস্ট ধরনের সমাজের ভিতরকার সংগঠনের বিশিষ্ট রূপটি খুলে ধরল। এই আদিম গোষ্ঠীগুলি ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ভিন্ন ভিন্ন এবং শেষ পর্যন্ত পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়তে থাকে। এই ভাঙনের ধারাটা অনুসরণের আমি চেষ্টা করেছি আমার *"Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats"* ('পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি') গ্রন্থটিতে, দ্বিতীয় সংস্করণ, স্টুটগার্ট, ১৮৮৬। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)(৪) — কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

der

Kommunistischen Partei.

Veröffentlicht im Februar 1848.

Proletarier aller Länder vereinigt euch.

London.

Gedruckt in der Office der „Bildungs-Gesellschaft für Arbeiter"
von J. E. Burghard.
46, Liverpool Street, Bishopsgate.

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের' প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপট।

ভূমিদাস, গিল্ড্-কর্তা* আর কারিগর, এক কথায় অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও আড়ালে কখনও বা প্রকাশ্যে; প্রতিবার এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির সকলের ধ্বংসপ্রাপ্তিতে।

ভূতপূর্ব ঐতিহাসিক যুগগুলিতে প্রায় সর্বত্র আমরা দেখি সমাজে বিভিন্ন বর্গের একটা জটিল বিন্যাস, সামাজিক পদমর্যাদার নানাবিধ ধাপ। প্রাচীন রোমে ছিল প্যাট্রিশিয়ান, যোদ্ধা (knights), প্লিবিয়ান এবং ক্রীতদাসেরা; মধ্যযুগে ছিল সামন্ত প্রভু, অনু-সামন্ত (vassals), গিল্ড্-কর্তা, কারিগর, শিক্ষানবিশ কারিগর এবং ভূমিদাস। এইসব শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে আবার আভ্যন্তরীণ স্তরভেদ।

সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক যে বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ শেষ হয়ে যায় নি। এ সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণী, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নতুন ধরন।

আমাদের যুগ অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের কিন্তু এই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে: শ্রেণী-বিরোধ এতে সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজ ক্রমেই দুটি বিশাল শত্রুশিবিরে ভাগ হয়ে পড়ছে, ভাগ হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখীন দুই বিরাট শ্রেণীতে — বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত।

মধ্যযুগের ভূমিদাসদের ভিতর থেকে প্রথম শহরগুলির স্বাধীন নাগরিকদের (chartered burghers) উদ্ভব হয়। এই নাগরিকদের মধ্য থেকে আবার বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রথম উপাদানগুলি বিকশিত হল।

আমেরিকা আবিষ্কার ও আফ্রিকা প্রদক্ষিণে উঠতি বুর্জোয়াদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে গেল। পূর্ব ভারত ও চীনের বাজার, আমেরিকায় উপনিবেশস্থাপন, উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্য, বিনিময়-ব্যবস্থার তথা সাধারণভাবে পণ্যের প্রসার বাণিজ্যে নৌযাত্রায় শিল্পে দান করে অভূতপূর্ব একটা উদ্যোগ এবং তদ্দ্বারা টলায়মান সামন্ত সমাজের অভ্যন্তরস্থ বিপ্লবী অংশগুলির জন্য এনে দেয় দ্রুত একটা বিকাশ।

---

* গিল্ড্-কর্তা, অর্থাৎ গিল্ড্ সঙ্ঘের পূর্ণ সদস্য, গিল্ডের অন্তর্ভুক্ত কর্তা, উপরিস্থিত প্রভু নয়। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

সামন্ত শিল্প-ব্যবস্থায় শিল্পোৎপাদনের একচেটিয়া ছিল গণ্ডিবদ্ধ গিল্ড্গুলির হাতে, নতুন বাজারের চাহিদার পক্ষে তা আর পর্যাপ্ত নয়। তার জায়গায় এল হস্তশিল্প কারখানা। কারখানাজীবী মধ্য শ্রেণী ঠেলে সরিয়ে দিল গিল্ড্-কর্তাদের। বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট গিল্ডের মধ্যেকার শ্রমবিভাগ মিলিয়ে গেল একই কারখানার ভেতরকার শ্রমবিভাগের সামনে।

এদিকে বাজার বাড়তেই থাকে, চাহিদা বাড়তে থাকে। হস্তশিল্প কারখানাতেও আর কুলাল না। অতঃপর বাষ্প ও কলের যন্ত্রে বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটল শিল্পোৎপাদনে। হস্তশিল্প কারখানার জায়গা নিল অতিকায় আধুনিক শিল্প, শিল্পজীবী মধ্য শ্রেণীর জায়গা নিল শিল্পজীবী লাখপতি, এক একটা গোটা শিল্প বাহিনীর হর্তাকর্তা, আধুনিক বুর্জোয়া।

আমেরিকা আবিষ্কার যার পথ পরিষ্কার করে, সেই বিশ্ববাজার প্রতিষ্ঠা করেছে আধুনিক শিল্প। এ বাজারের ফলে বাণিজ্য, নৌযাত্রা, স্থলপথ যোগাযোগের প্রভূত বিকাশ ঘটেছে। সে বিকাশ আবার প্রভাবিত করেছে শিল্প প্রসারকে, এবং যে অনুপাতে শিল্প, বাণিজ্য, নৌযাত্রা ও রেলপথের প্রসার, সেই অনুপাতেই বিকশিত হয়েছে বুর্জোয়া, বাড়িয়ে তুলেছে তার পুঁজি, মধ্যযুগ থেকে আগত সমস্ত শ্রেণীকেই পেছনে ঠেলে দিয়েছে।

এইভাবে দেখা যায় যে আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণীটা একটা দীর্ঘ বিকাশ ধারার ফল, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির ক্রমান্বয় বিপ্লবের পরিণতি।

বিকাশের পথে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সমানে চলেছিল সে শ্রেণীর রাজনৈতিক অগ্রগতি। এই যে বুর্জোয়ারা ছিল সামন্ত প্রভুদের আমলে একটা নিষ্পেষিত শ্রেণী, মধ্যযুগের কমিউনে* যারা দেখা দেয় একটা সশস্ত্র ও স্বশাসিত সংঘ রূপে, কোথাও বা স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক

---

* ফ্রান্সে নবোদ্ভূত শহরগুলি সামন্ত মনিব ও প্রভুদের কাছ থেকে স্থানীয় স্বশাসন ও রাজনৈতিক অধিকার আদায় করে 'তৃতীয় মণ্ডলী' (Third Estate) রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই 'কমিউন' নাম গ্রহণ করে। মোটামুটি বলা চলে যে বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এখানে ইংলণ্ডকে আদর্শ দেশ ধরা হয়েছে, রাজনৈতিক বিকাশের বেলা ফ্রান্সকে। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

ইতালি ও ফ্রান্সের শহরবাসীরা তাদের সামন্ত প্রভুদের হাত থেকে আত্মশাসনের প্রাথমিক অধিকার কিনে অথবা কেড়ে নেবার পর নিজেদের নগর-সমাজের এই নাম দিয়েছিল। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

নগর রাষ্ট্র (যেমন ইতালি ও জার্মানিতে), আবার কোথাও বা রাজতন্ত্রের করদাতা 'তৃতীয় মণ্ডলী' রূপে (যেমন ফ্রান্সে), অতঃপর হস্তশিল্প পদ্ধতির প্রকৃত পর্বে যারা আধা সামন্ততান্ত্রিক বা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের কাজে লাগে অভিজাতবর্গকে দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে, এবং বস্তুত সাধারণভাবে যারা ছিল বৃহৎ রাজতন্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ, সেই বুর্জোয়া শ্রেণী অবশেষে আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও বিশ্ববাজার প্রতিষ্ঠার পর, আজকালকার প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের জন্য পরিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করতে পেরেছে। আধুনিক রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী হল সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার একটা কমিটি মাত্র।

ইতিহাসের দিক থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছে।

বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। যে সব বিচিত্র সামন্ত বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল তার 'স্বভাবসিদ্ধ ঊর্ধ্বতন'দের কাছে, তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার 'নগদ টাকার' বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখে নি। আত্মসর্বস্ব হিসাবনিকাশের বরফজলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্ম-উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ ও কূপমণ্ডূক ভাবালুতা। লোকের ব্যক্তি-মূল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময় মূল্যে, অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা এনে খাড়া করল ওই একটিমাত্র নির্বিচার স্বাধীনতা — অবাধ বাণিজ্য। এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমে যে শোষণ এতদিন ঢাকা ছিল, তার বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ, পাশবিক শোষণ।

মানুষের যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী — সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরি-ভোগী শ্রমজীবী রূপে।

বুর্জোয়া শ্রেণী পরিবারপ্রথা থেকে তার ভাবালু ঘোমটাটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে, পারিবারিক সম্বন্ধকে পরিণত করেছে একটা নিছক আর্থিক সম্পর্কে।

মধ্যযুগে শক্তির যে পাশবিক প্রকাশকে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এতটা মাথায়

তোলে, তারই যোগ্য পরিপূরক হিসাবে চূড়ান্ত অলসতার নিষ্ক্রিয়তা কী করে সম্ভব হয়েছিল তা বুর্জোয়া শ্রেণীই ফাঁস করে দেয়। এরাই প্রথম দেখিয়ে দিল মানুষের উদ্যমে কী হতে পারে। এদের আশ্চর্য কীর্তি মিশরের পিরামিড, রোমের পয়ঃপ্রণালী এবং গথিক গির্জাকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। এদের পরিচালিত অভিযান অতীতের সকল জাতির দেশান্তর যাত্রা (Exoduses) ও ধর্মযুদ্ধকে (crusades) ম্লান করে দিয়েছে।

উৎপাদনের উপকরণে অবিরাম বিপ্লবী বদল না এনে, এবং তাতে করে উৎপাদন-সম্পর্ক ও সেইসঙ্গে সমগ্র সমাজ-সম্পর্কে বিপ্লবী বদল না ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী বাঁচতে পারে না। অপরদিকে অতীতের শিল্পজীবী সকল শ্রেণীর বেঁচে থাকার প্রথম শর্তই ছিল সাবেকি উৎপাদন-পদ্ধতির অপরিবর্তিত রূপটা বজায় রাখা। আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হল উৎপাদনে অবিরাম বিপ্লবী পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনা। অনড় জমাট সব সম্পর্ক ও তার আনুষঙ্গিক সমস্ত সনাতন শ্রদ্ধাভাজন কুসংস্কার ও মতামতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়, নবগঠিতগুলো দৃঢ়সম্বদ্ধ হয়ে উঠবার আগেই অচল হয়ে আসে। যা কিছু ভারিক্কী তা-ই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়, যা পবিত্র তা হয় কলুষিত, শেষ পর্যন্ত মানুষ বাধ্য হয় তার জীবনের আসল অবস্থা এবং অপরের সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে খোলা চোখে দেখতে।

নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্য অবিরত বর্ধমান এক বাজারের তাগিদ বুর্জোয়া শ্রেণীকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়। সর্বত্র তাদের ঢুকতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র।

বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্ববাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও উপভোগে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষুব্ধ করে তারা শিল্পের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়েছে সেই জাতীয় ভূমিটা যার ওপর শিল্প আগে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত সাবেকি জাতীয় শিল্প হয় ধ্বংস পেয়েছে নয় প্রত্যহ ধ্বংস পাচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন নতুন নতুন শিল্প যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির পক্ষেই মরা বাঁচা প্রশ্নের সামিল; এমন শিল্প যা শুধু দেশজ কাঁচামাল নিয়ে নয় দূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামালে কাজ করছে; এমন শিল্প যার উৎপাদন শুধু স্বদেশেই নয়. ভূলোকের সর্বাঞ্চলেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ উৎপন্নে যা মিটত

তেমন সব পুরনো চাহিদার বদলে দেখছি নতুন চাহিদা, যা মেটাতে দরকার সুদূর দেশ বিদেশের ও নানা আবহাওয়ার উৎপন্ন। আগেকার স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও স্বপর্যাপ্তির বদলে পাচ্ছি সর্বক্ষেত্রেই আদান-প্রদান, জাতিসমূহের বিশ্বজোড়া পরস্পর নির্ভরতা। বৈষয়িক উৎপাদনে যেমন, তেমনই মনীষার ক্ষেত্রেও। এক একটা জাতির মানসিক সৃষ্টি হয়ে পড়ে সকলের সম্পত্তি। জাতিগত একপেশেমি ও সংকীর্ণচিত্ততা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ে; অসংখ্য জাতীয় বা স্থানীয় সাহিত্য থেকে জেগে ওঠে একটা বিশ্বসাহিত্য।

সকল উৎপাদন-যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফত বুর্জোয়ারা সভ্যতায় টেনে আনছে সমস্ত, এমন কি অসভ্যতম জাতিকেও। যে জগদ্দল কামান দেগে সে সমস্ত চীনা প্রাচীর চূর্ণ করে, অসভ্য জাতিদের অতি একরোখা বিজাতি-বিদ্বেষকে বাধ্য করে আত্মসমর্পণে তা হল তার পণ্যের শস্তা দর। সকল জাতিকে সে বাধ্য করে বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণে, অন্যথায় বিলুপ্ত হয়ে যাবার ভয় থাকে; বাধ্য করে সেই বস্তু গ্রহণে যাকে সে বলে সভ্যতা — অর্থাৎ বাধ্য করে তাদের বুর্জোয়া বনতে। এক কথায়, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তোলে।

গ্রামাঞ্চলকে বুর্জোয়া শ্রেণী শহরের পদানত করেছে। সৃষ্টি করেছে বিরাট বিরাট শহর, গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বাড়িয়েছে প্রচুর, এবং এইভাবে জনগণের এক বিশাল অংশকে বাঁচিয়েছে গ্রামজীবনের মূঢ়তা থেকে। গ্রামাঞ্চলকে এরা যেমন শহরের মুখাপেক্ষী করে তুলেছে, ঠিক তেমনই বর্বর বা অর্ধবর্বর দেশগুলিকে করেছে সভ্য দেশের উপর, চাষীবহুল জাতিকে করেছে বুর্জোয়া-প্রধান জাতির, পূর্বাঞ্চলকে পশ্চিমের উপর নির্ভরশীল।

অধিবাসীদের, উৎপাদন-উপায়ের এবং সম্পত্তির বিক্ষিপ্ত অবস্থাটা বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমশই ঘুচিয়ে দিতে থাকে। জনসংখ্যাকে এরা পুঞ্জীভূত করেছে, উৎপাদনের উপায়গুলি করেছে কেন্দ্রীভূত, সম্পত্তিকে জড়ো করেছে অল্প লোকের হাতে। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হল রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ, আইনকানুন, শাসন-ব্যবস্থা অথবা করপ্রথা সম্বলিত স্বাধীন কিংবা শিথিলভাবে সংযুক্ত প্রদেশগুলিকে ঠেসে মেলানো হয় এক একটা জাতিতে যাদের একই শাসন-যন্ত্র, একই আইন সংহিতা, একই জাতীয় শ্রেণী-স্বার্থ, একই সীমান্ত, এবং একই শুল্ক-ব্যবস্থা।

আধিপত্যের এক শতাব্দী পূর্ণ হতে না হতে, বুর্জোয়া শ্রেণী যে উৎপাদন-শক্তির সৃষ্টি করেছে তা অতীতের সকল যুগের সমষ্টিগত উৎপাদন-শক্তির চেয়েও বিশাল ও অতিকায়। প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের কর্তৃত্বাধীন করা, যন্ত্রের ব্যবহার, শিল্প ও কৃষিতে রসায়নের প্রয়োগ, বাষ্পশক্তির সাহায্যে জলযাত্রা, রেলপথ, ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ, চাষবাসের জন্য গোটা মহাদেশ সাফ করে ফেলা, জলযাত্রার জন্য নদীর খাত কাটা, ভেলকিবাজির মতো যেন মাটি ফুঁড়ে জনসমষ্টির আবির্ভাব — সামাজিক শ্রমের কোলে যে এতখানি উৎপাদন-শক্তি সুপ্ত ছিল, আগেকার কোন শতক তার কল্পনাটুকুও করতে পেরেছিল?

তাই দেখা যাচ্ছে যে উৎপাদন ও বিনিময়ের যে সব উপায়কে ভিত্তি করে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের গড়ে তুলেছে, তাদের উৎপত্তি সামন্ত সমাজের মধ্যে। উৎপাদন ও বিনিময়ের এই সব উপায় বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়ে এল যখন সামন্ত সমাজের উৎপাদন ও বিনিময়ের শর্ত, সামন্ত কৃষি ও হস্তশিল্প কারখানার সংগঠন, এক কথায় মালিকানার সামন্ত সম্পর্কগুলি আর কিছুতেই বিকশিত উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে খাপ খেল না। এগুলি তখন শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে শৃঙ্খল ভাঙতে হত এবং তা ভেঙে ফেলা হল।

তাদের জায়গায় এগিয়ে এল অবাধ প্রতিযোগিতা, সেইসঙ্গে তারই উপযোগী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব।

আমাদের চোখের সামনে আজ অনুরূপ আর এক ধারা চলেছে। নিজের উৎপাদন-সম্পর্ক, বিনিময়-সম্পর্ক ও সম্পত্তি-সম্পর্ক সহ আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ — ভেলকিবাজির মতো উৎপাদনের এবং বিনিময়ের এমন বিশাল উপায় গড়ে তুলেছে যে সমাজ, তার অবস্থা আজ সেই যাদুকরের মতো যে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তুলে আর সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। গত বহু দশক ধরে শিল্প বাণিজ্যের ইতিহাস হল শুধু বর্তমান উৎপাদন-সম্পর্কের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের যা মূলশর্ত সেই মালিকানা সম্পর্কের বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন-শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস। যে বাণিজ্য-সংকট পালা করে ফিরে ফিরে এসে প্রতিবার আরো বেশি করে গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন করে ফেলে, তার উল্লেখই যথেষ্ট। এইসব সংকটে শুধু যে উপস্থিত উৎপন্নের অনেকখানি

নষ্ট হয়ে যায় তাই নয়, আগেকার সৃষ্ট উৎপাদন-শক্তির অনেকটাও এতে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস পায়। এইসব সংকটের ফলে এমনই এক মহামারী হাজির হয় অতীতের সকল যুগে যা অসম্ভব গণ্য করা হত — অতি উৎপাদনের মহামারী। হঠাৎ সমাজ যেন এক সাময়িক বর্বরতার পর্যায়ে ফিরে যায়; মনে হয় যেন বা এক দুর্ভিক্ষে, এক সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে বন্ধ হয়ে গেল জীবনধারণের সমস্ত উপায়-সরবরাহের পথ, শিল্প বাণিজ্য যেন নষ্ট হয়ে গেল; কী কারণে? কারণ, সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হয়েছে, জীবনধারণ সামগ্রীতে দেখা দিয়েছে অতিপ্রাচুর্য, অনেক বেশি হয়ে গেছে শিল্প, অনেক বেশি বাণিজ্য। সমাজের হাতে যত উৎপাদন-শক্তি আছে, বুর্জোয়া মালিকানার শর্ত বিকাশে তা আর সাহায্য করছে না; বরং এই যে শর্তে সে শক্তি শৃঙ্খলিত ছিল তার তুলনায় এ শক্তি হয়ে উঠেছে অনেক বেশি প্রবল; শৃঙ্খলের বাধা তা কাটিয়ে ওঠা মাত্র সমস্ত বুর্জোয়া সমাজে এনে ফেলে বিশৃঙ্খলতা, বিপন্ন করে বুর্জোয়া মালিকানার অস্তিত্ব। বুর্জোয়া সমাজ যে সম্পদ উৎপন্ন করে তাকে ধারণ করার পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা বড়ই সংকীর্ণ। এই সংকট থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী আবার কোন উপায়ে নিস্তার পায়? একদিকে, উৎপাদন-শক্তির বিপুল অংশ বাধ্য হয়ে নষ্ট করে ফেলে, অপরদিকে নতুন বাজার দখল করে এবং পুরানো বাজারের পূর্ণতর শোষণে। অর্থাৎ বলা যায় যে আরও ব্যাপক আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথে, সংকট এড়াবার যা উপায় তাকেই কমিয়ে এনে।

যে অস্ত্রে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করেছিল সেই অস্ত্র আজ তাদেরই বিরুদ্ধে উদ্যত।

যে অস্ত্রে তাদের মৃত্যু বুর্জোয়া শ্রেণী শুধু সে অস্ত্রটুকুই গড়ে নি; এমন লোকও তারা সৃষ্টি করেছে যারা সে অস্ত্র ধারণ করবে, সৃষ্টি করেছে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীকে, প্রলেতারিয়েতকে।

যে পরিমাণে বুর্জোয়া শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজি বেড়ে চলে ঠিক সেই অনুপাতে বিকাশ পায় প্রলেতারিয়েত অর্থাৎ আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতীদের এ শ্রেণীটি বাঁচতে পারে যতক্ষণ কাজ জোটে, আর কাজ জোটে শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের পরিশ্রমে পুঁজি বাড়তে থাকে। এই মেহনতীদের নিজেদের টুকরো টুকরো করে বেচতে হয়। বাণিজ্যের অন্য সামগ্রীর মতোই তারা পণ্যদ্রব্যের সামিল। আর সেই হেতু নিয়তই

প্রতিযোগিতার সবকিছু ঝড় ঝাপটা, বাজারের সবরকম ওঠানামার অধীন তারা।

যন্ত্রের বহুল ব্যবহার এবং শ্রমবিভাগের ফলে প্রলেতারিয়েতের কাজ আজ সকল ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে, এবং সেই হেতু মজুরের কাছে কাজের আকর্ষণ লোপ পেয়েছে। মজুর হয়েছে যন্ত্রের লেজুড়, তার কাছে চাওয়া হয় অতি সরল, একান্ত একঘেয়ে, অতি সহজে অর্জনীয় যোগ্যতাটুকু। সুতরাং মজুরের উৎপাদন খরচটাও সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে প্রায় একান্তই তাকে বাঁচিয়ে রাখার ও তার বংশরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকুর মধ্যে। কিন্তু পণ্যের দাম, অতএব শ্রমেরও দাম(৫) তার উৎপাদন খরচার সমান। সুতরাং কাজের জঘন্যতা যত বাড়ে, মজুরি তত কমে। শুধু তাই নয়, যে পরিমাণে যন্ত্রের ব্যবহার ও শ্রমবিভাগ বাড়ে, সেই অনুপাতে বাড়ে কাজের চাপ, হয় খাটুনির ঘণ্টা বাড়িয়ে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বেশি কাজ আদায় করে, অথবা যন্ত্রের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে, ইত্যাদি।

আধুনিক যন্ত্রশিল্প পিতৃতান্ত্রিক মালিকের ছোট কর্মশালাকে শিল্প-পুঁজিপতির বিরাট ফ্যাক্টরিতে পরিণত করেছে। বিপুল সংখ্যায় মজুরকে ফ্যাক্টরির মধ্যে ঢোকান হয় ভিড় করে, সংগঠিত করা হয় সৈনিকের ধরনে। শিল্পবাহিনীর সাধারণ সৈন্য হিসাবে তারা থাকে অফিসার সার্জেণ্টদের এক খাঁটি বহুধাপী ব্যবস্থার অধীনে। মজুরেরা কেবলমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দাস নয়; দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে তাদের করা হচ্ছে যন্ত্রের দাস, পরিদর্শকের দাস, সর্বোপরি খাস বুর্জোয়া মালিকটির দাস। এই যথেচ্ছাচার যত খোলাখুলিভাবে মুনাফালাভকেই নিজের লক্ষ্য ও আদর্শ হিসাবে ঘোষণা করে ততই তা হয়ে ওঠে আরও হীন, আরও ঘৃণ্য, আরও তিক্ত।

শারীরিক মেহনতে দক্ষতা ও শক্তি যতই কম লাগতে থাকে, অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্রশিল্প যতই বিকশিত হয়ে ওঠে, ততই পুরুষের পরিশ্রমের স্থান জুড়ে বসতে থাকে নারী শ্রম। শ্রমিক শ্রেণীর কাছে বয়স কিংবা নারী-পুরুষের তফাতটার এখন আর বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য নেই। সকলেই তারা খাটবার যন্ত্রমাত্র; বয়স অথবা স্ত্রী-পুরুষের তফাত অনুসারে সে যন্ত্র ব্যবহারের খরচটুকু কিছু বাড়ে-কমে মাত্র।

শিল্পের মালিক কর্তৃক মজুরের শোষণ খানিকটা সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র

অর্থাৎ তার মজুরির টাকাটা পাওয়া মাত্র, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যান্য অংশ — বাড়িওয়ালা, দোকানদার, মহাজন প্রভৃতি।

মধ্য শ্রেণীর নিম্ন স্তর — ছোটখাট ব্যবসায়ী, দোকানদার, সাধারণত ভূতপূর্ব কারবারীরা সবাই, হস্তশিল্পী এবং চাষীরা — তারা ধীরে ধীরে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নেমে আসে। তার এক কারণ, যতখানি বড় আয়তনে আধুনিক শিল্প চালাতে হয় এদের সামান্য পুঁজি তার পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং প্রতিযোগিতায় বড় পুঁজিপতিরা এদের গ্রাস করে ফেলে; অপর কারণ, উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির ফলে এদের বিশিষ্ট নৈপুণ্যটুকু অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রলেতারিয়েতের পুষ্টিলাভ হতে থাকে জনগণের প্রতিটি শ্রেণী থেকে আগত লোকের দ্বারা।

বিকাশের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে যেতে হয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এর সংগ্রাম শুরু হয় জন্ম মুহূর্ত থেকে। প্রথমটা লড়াই চালায় বিশেষ বিশেষ মজুরেরা; তারপর লড়তে থাকে গোটা ফ্যাক্টরির মেহনতীরা; তারপর কোনও একটা অঞ্চলের একই পেশায় নিযুক্ত সকল শ্রমিকেরা তাদের সাক্ষাৎ শোষণকারী বিশিষ্ট পুঁজিপতিটির বিরুদ্ধে লড়ে। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয় উৎপাদনের উপকরণ, উৎপাদনের বুর্জোয়া ব্যবস্থাটা নয়; যে আমদানি মাল তাদের মেহনতের প্রতিযোগিতা করে সেগুলি তারা ধ্বংস করে, কল ভেঙে চুরমার করে দেয়, কারখানায় আগুন লাগায়, মধ্যযুগের মেহনতকারীর যে মর্যাদা লোপ পেয়েছে, গায়ের জোরে চায় তা ফিরিয়ে আনতে।

এই পর্যায়ে মজুরেরা তখনও দেশময় ছড়ানো এলোমেলো জনতামাত্র, পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ছত্রভঙ্গ। কোথাও যদি তারা অধিকতর সংহত সংস্থায় একজোটও হয়, তবু সেটা তখনও নিজস্ব সক্রিয় সম্মিলনের ফল নয়, বরং বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্মিলনের ফলমাত্র। এ শ্রেণী নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য গোটা প্রলেতারিয়েতকে সচল করতে বাধ্য হয়, তখনও কিছু দিনের জন্য সে চেষ্টায় সফলও হয়। সুতরাং এই পর্যায়ে মজুরেরা লড়ে নিজেদের শত্রুর বিপক্ষে নয়, শত্রুর শত্রু, অর্থাৎ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অবশিষ্টাংশ, জমিদার, শিল্প বহির্ভূত বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। এ অবস্থায় ইতিহাসের সমস্ত গতিটি বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতের মুঠোর মধ্যে থাকে; এভাবে অর্জিত প্রতিটি জয় হল বুর্জোয়ার জয়।

কিন্তু যন্ত্রশিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী কেবল সংখ্যায় বাড়ে না; তারা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে বৃহত্তর সমষ্টিতে, তাদের শক্তি বাড়তে থাকে, আপন শক্তি তারা বেশি করে উপলব্ধি করে। কলকারখানা যে অনুপাতে বিভিন্ন ধরনের শ্রমের পার্থক্য মুছে ফেলতে থাকে আর প্রায় সর্বত্র মজুরি কমিয়ে আনে একই নিচু স্তরে, সেই অনুপাতে প্রলেতারিয়েত বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ ও জীবনযাত্রার অবস্থা ক্রমেই সমান হয়ে যেতে থাকে। বুর্জোয়াদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা এবং তৎপ্রসূত বাণিজ্য-সংকটে শ্রমিকের মজুরি হয় আরও বেশি দোদুল্যমান। যন্ত্রের অবিরাম উন্নতি ক্রমেই আরো দ্রুততালে বাড়তে থাকে, মজুরের জীবিকা হয়ে পড়ে আরও বিপন্ন; এক একদল মজুরের সঙ্গে এক একজন বুর্জোয়ার সংঘর্ষ ক্রমেই বেশি করে দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বের রূপ নেয়। তখন মজুরেরা মিলিত সমিতি গঠন শুরু করে (ট্রেড ইউনিয়ন) বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে; মজুরির হার বজায় রাখার জন্য জোট বাঁধে; মাঝে মধ্যে ঘটা এই বিদ্রোহের আগে থাকতে প্রস্তুতির জন্য স্থায়ী সংগঠন গড়ে। এখানে ওখানে দ্বন্দ্ব পরিণত হয় অভ্যুত্থানে।

মাঝে মাঝে শ্রমিকেরা জয়ী হয়, কিন্তু কেবল অল্পদিনের জন্য। তাদের সংগ্রামের আসল লাভ আশু ফলাফলে নয়, মজুরদের ক্রমবর্ধমান একতায়। এই একতার সহায় হয় যোগাযোগের উন্নত ব্যবস্থা, আধুনিক শিল্প যার সৃষ্টি করেছে এবং যার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার মজুরেরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। এক জাতীয় অসংখ্য স্থানীয় লড়াইকে দেশব্যাপী এক শ্রেণী-সংগ্রামে কেন্দ্রীভূত করার জন্য ঠিক এই সংযোগটারই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রত্যেকটা শ্রেণী-সংগ্রামই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম। শোচনীয় রাস্তাঘাটের দরুন যে ঐক্য আনতে মধ্যযুগের নাগরিকদের শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগেছিল, আধুনিক শ্রমিকেরা তা অর্জন করে রেলপথের কল্যাণে মাত্র কয়েক বছরে।

মজুরদের পরস্পরের মধ্যেই প্রতিযোগিতা আবার তাদের শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হওয়া এবং তার ফলে এক রাজনৈতিক দলে পরিণত হওয়াকে প্রতিক্ষণে ব্যর্থ করে দেয়। কিন্তু প্রতিবারই প্রবলতর, দৃঢ়তর, আরও শক্তিশালী হয়ে সংগঠন মাথা তোলে। এরই চাপে বুর্জোয়াদের মধ্যে বিভেদের ফলে শ্রমিকদের এক একটা স্বার্থকে আইনত মেনে নিতে হয়। ইংলন্ডে দশ ঘণ্টার আইন এইভাবে পাশ হয়েছিল।

মোটের উপর, পুরনো সমাজের নানা শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত প্রলেতারিয়েতের বিকাশে নানাভাবে সাহায্য করে। বুর্জোয়া শ্রেণীকে লিপ্ত থাকতে হয় অবিরাম সংগ্রামে। প্রথমে লড়াই হয় অভিজাতদের সঙ্গে; পরে বুর্জোয়া শ্রেণীরই যে যে অংশের স্বার্থ যন্ত্রশিল্প বিস্তারের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় তাদের বিরুদ্ধে; আর সর্বদাই বিদেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। এইসব সংগ্রামেই বুর্জোয়াদের বাধ্য হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে আবেদন করতে হয়, সাহায্য চাইতে হয় তাদেরই কাছে, তাদের টেনে আনতে হয় রাজনীতির প্রাঙ্গণে। সুতরাং বুর্জোয়ারা নিজেরাই প্রলেতারিয়েতকে তাদের রাজনৈতিক ও সাধারণ শিক্ষার কিছুটা জোগাতে থাকে; অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়বার অস্ত্র প্রলেতারিয়েতকে তারাই জোগায়।

এছাড়া আমরা আগেই দেখেছি যে শিল্পের অগ্রগতির ফলে শাসক শ্রেণীর মধ্য থেকে গোটাগুটি এক একটা অংশ প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা অন্তত বিপন্ন হয়। এরাও আবার প্রলেতারিয়েতকে জোগায় জ্ঞানলাভ ও প্রগতির নতুন নতুন উপাদান।

শেষ পর্যন্ত শ্রেণী-সংগ্রাম যখন চূড়ান্ত মুহূর্তের কাছে এসে পড়ে, তখন শাসক শ্রেণীর মধ্যে, বস্তুতপক্ষে পুরানো সমাজের গোটা পরিধি জুড়ে ভাঙনের যে প্রক্রিয়া চলেছে তা এমন একটা প্রখর হিংস্র রূপ নেয় যে শাসক শ্রেণীর একটা ছোট অংশ পর্যন্ত ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে, হাত মেলায় বিপ্লবী শ্রেণীর সঙ্গে, সেই শ্রেণীর সঙ্গে যার হাতেই ভবিষ্যৎ। সুতরাং আগেকার এক যুগে যেমন অভিজাতদের একটা অংশ বুর্জোয়া শ্রেণীর দিকে চলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনই এখন বুর্জোয়াদের একটা ভাগ যোগ দেয় শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে, বিশেষ করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের কিছু কিছু, যারা ইতিহাসের সমগ্র গতিকে তত্ত্বের দিক থেকে বুঝতে পারার স্তরে নিজেদের তুলতে পেরেছে।

আজকের দিনে বুর্জোয়াদের মুখামুখি যেসব শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে শুধু প্রলেতারিয়েত হল প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী। অপর শ্রেণীগুলি আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সামনে ক্ষয় হতে হতে লোপ পায়; প্রলেতারিয়েত হল সেই যন্ত্রশিল্পের বিশিষ্ট ও অপরিহার্য সৃষ্টি।

নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছোট হস্তশিল্প কারখানার মালিক, দোকানদার, কারিগর চাষী — এরা সকলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে মধ্য শ্রেণীর টুকরো হিসাবে

নিজেদের অস্তিত্বটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্য। তাই তারা বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল। বলতে গেলে প্রতিক্রিয়াশীলও, কেননা ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘোরাবার চেষ্টা করে তারা। দৈবক্রমে যদি এরা বিপ্লবী হয় তবে তা হয় কেবল তাদের প্রলেতারিয়েত রূপে আসন্ন রূপান্তরের কারণে; সুতরাং তারা তখন রক্ষা করে তাদের বর্তমান স্বার্থ নয়, ভবিষ্যৎ স্বার্থ; নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে তারা গ্রহণ করে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি।

পুরানো সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে ছিটকে-পড়া যে সব লোক নিষ্ক্রিয়ভাবে পচছে, সেই সামাজিক আবর্জনাটাকে, সেই 'বিপজ্জনক শ্রেণীকে' শ্রমিক বিপ্লব এখানে ওখানে আন্দোলনের মধ্যে ঝেঁটিয়ে নিয়ে আসতে পারে; কিন্তু এদের জীবনযাত্রার ধরনটা এমনই যে তা প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের ভাড়াটে হাতিয়ারের ভূমিকার জন্যই তাদের অনেক বেশি তৈরি করে তোলে।

পুরানো সমাজের সাধারণ পরিস্থিতিটা প্রলেতারিয়েতের জীবনে ইতিমধ্যেই প্রায় লোপ পেতে বসেছে। প্রলেতারিয়েতের সম্পত্তি নেই; স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে তার যা সম্বন্ধ সেটা আর বুর্জোয়া পারিবারিক সম্বন্ধের সঙ্গে মেলে না; আধুনিক শিল্পশ্রম, পুঁজির কাছে আধুনিক ধরনের অধীনতা, যা ইংলন্ড বা ফ্রান্স, আমেরিকা অথবা জার্মানিতে একই প্রকার, তাতে তার জাতীয় চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই লোপ পেয়েছে। তার কাছে আইন, নীতি, ধর্ম হল কয়েকটা বুর্জোয়া কুসংস্কার মাত্র যার পিছনে ওঁৎ পেতে আছে বুর্জোয়া স্বার্থ।

অতীতের যে সব শ্রেণী কর্তৃত্ব পেয়েছে তারা সবাই অর্জিত প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করতে চেয়েছে গোটা সমাজের ওপর তাদের দখলির শর্তটা চাপিয়ে দিয়ে। প্রলেতারিয়েতের পক্ষে তাদের দখলির নিজস্ব পূর্বতন পদ্ধতি উচ্ছেদ না করে এবং তাতে করে দখলির প্রত্যেকটি ভূতপূর্ব পদ্ধতির অবসান না ঘটিয়ে, সমাজের উৎপাদন-শক্তির উপর প্রভুত্ব লাভ সম্ভব নয়। তাদের নিজস্ব বলতে এমন কিছু নেই যাকে রক্ষা অথবা দৃঢ়তর করতে হবে; ব্যক্তিগত মালিকানার সমস্ত পূর্বতন নিরাপত্তা ও নিশ্চিতি নির্মূল করে দেওয়াই তাদের ব্রত।

অতীত ইতিহাসে প্রতিটি আন্দোলন ছিল সংখ্যাল্পের দ্বারা অথবা সংখ্যাল্পের স্বার্থে আন্দোলন। প্রলেতারীয় আন্দোলন হল বিরাট সংখ্যাধিকের

স্বার্থে বিপুল সংখ্যাধিকের আত্মসচেতন স্বাধীন আন্দোলন। প্রলেতারিয়েত আজকের সমাজে নিম্নতম স্তর; তাকে নড়তে হলে, উঠে দাঁড়াতে হলে, উপরে চাপানো সরকারী সমাজের গোটা স্তরটিকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত না করে উপায় নেই।

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের লড়াইটা মর্মবস্তুতে না হলেও আকারের দিক থেকে হল প্রথমত জাতীয় সংগ্রাম। প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েতকে অবশ্যই সর্বাগ্রে ফয়সালা করতে হবে স্বদেশী বুর্জোয়াদের সঙ্গে।

প্রলেতারিয়েতের বিকাশের সাধারণতম পর্যায়গুলির ছবি আঁকতে গিয়ে আমরা দেখিয়েছি যে বর্তমান সমাজের ভিতরে কমবেশি প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধ চলেছে, যে যুদ্ধ একটা বিন্দুতে এসে প্রকাশ্য বিপ্লবে পরিণত হয় এবং তখন বুর্জোয়াদের সবলে উচ্ছেদ করে স্থাপিত হয় প্রলেতারিয়েতের আধিপত্যের ভিত্তি।

আমরা আগেই দেখেছি যে আজ পর্যন্ত সব ধরনের সমাজ গড়ে উঠেছে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণীর বিরোধের ভিত্তিতে। কিন্তু কোনো শ্রেণীর উপর অত্যাচার বজায় রাখতে হলে তার জন্য এমন কিছুটা অবস্থা নিশ্চিত করতে হয় যাতে সে তার দাসোচিত অস্তিত্বটুকু অন্তত চালিয়ে যেতে পারে। ভূমিদাসত্বের যুগে ভূমিদাস নিজেকে কমিউন-সভ্যের পর্যায়ে তুলেছিল ঠিক যেমন সামন্ত স্বৈরতন্ত্রের পেষণতলেও পেটি বুর্জোয়া পেরেছিল বুর্জোয়া রূপে বিকশিত হতে। পক্ষান্তরে, আধুনিক শ্রমিক কিন্তু যন্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উপরে ওঠে না, স্বীয় শ্রেণীর অস্তিত্বের যা শর্ত, তারও নিচে ক্রমশই বেশি করে তাকে নেমে যেতে হয়। মজুর হয়ে পড়ে দুঃস্থ (pauper), আর দুঃস্থাবস্থা বেড়ে চলে জনসংখ্যা ও সম্পদবৃদ্ধির চেয়ে দ্রুততর তালে। এই সূত্রেই পরিষ্কার প্রতিপন্ন হয় যে বুর্জোয়া শ্রেণীর আর সমাজের শাসক হয়ে থাকার যোগ্যতা নেই, নিজেদের অস্তিত্বের শর্তটাকে চরম আইন হিসাবে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে রাখার অধিকার নেই। বুর্জোয়া শ্রেণী শাসন চালাবার উপযুক্ত নয়, কারণ তারা দাসত্বের মধ্যে দাসের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে অক্ষম, তাদের এমন অবস্থায় না নামিয়ে পারে না যেখানে দাসের দৌলতে খাওয়ার বদলে দাসকেই খাওয়াতে হয়। এই বুর্জোয়ার শাসনে সমাজ আর বেঁচে

থাকতে পারে না, অর্থাৎ অন্য ভাষায় বলতে গেলে তার অস্তিত্ব আর সমাজের সঙ্গে খাপ খায় না।

বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের মূলশর্ত হল পুঁজির সৃষ্টি ও বৃদ্ধি; পুঁজির শর্ত হল মজুরি-শ্রম। মজুরি-শ্রম সম্পূর্ণভাবে মজুরদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যন্ত্রশিল্পের যে অগ্রগতি বুর্জোয়া শ্রেণী না ভেবেই বাড়িয়ে চলে, তার ফলে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা-হেতু বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সম্মিলন-হেতু বিপ্লবী ঐক্য। সুতরাং, যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন করে ও উৎপন্ন দখল করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাই কেড়ে নিচ্ছে। তাই বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি করছে সর্বোপরি তারই সমাধিখনকদের। বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুইই সমান অনিবার্য।

২

প্রলেতারিয়েত ও কমিউনিস্টরা

সমগ্রভাবে প্রলেতারীয়দের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কী সম্বন্ধ?

শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টিগুলির প্রতিপক্ষ হিসাবে কমিউনিস্টরা স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করে না।

সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনো স্বার্থ তাদের নেই।

প্রলেতারীয় আন্দোলনকে রূপ দেওয়া বা গড়ে পিটে তোলার জন্য তারা নিজস্ব কোনও গোষ্ঠীগত নীতি খাড়া করে না।

শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টি থেকে কমিউনিস্টদের তফাতটা শুধু এই: (১) নানা দেশের মজুরদের জাতীয় সংগ্রামের ভিতর তারা জাতি-নির্বিশেষে সারা প্রলেতারিয়েতের সাধারণ স্বার্থটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকেই সামনে টেনে আনে। (২) বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইকে যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হয় তার মধ্যে তারা সর্বদা ও সর্বত্র সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

সুতরাং কমিউনিস্টরা হল একদিকে কার্যক্ষেত্রে প্রতি দেশের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলির সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও দৃঢ়চিত্ত অংশ — যে অংশ অন্যান্য সবাইকে সামনে ঠেলে নিয়ে যায়। অপরদিকে, তত্ত্বের দিক দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশের তুলনায় তাদের এই সুবিধা যে শ্রমিক আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত এবং শেষ সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ বোধ রয়েছে।

কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য শ্রমিকদের অন্যান্য পার্টির উদ্দেশ্য থেকে অভিন্ন: প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণী হিসাবে গঠিত করা, বুর্জোয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার।

কমিউনিস্টদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি মোটেই এমন কোনো ধারণা বা মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় যা বিশেষ কোনো ভাবী বিশ্বসংস্কারকের রচনা বা আবিষ্কার।

যে শ্রেণী-সংগ্রাম, যে ঐতিহাসিক আন্দোলন আমাদের নিজের চোখের সামনে বর্তমান তা থেকে বাস্তব যে সম্পর্কগুলির উৎপত্তি, কমিউনিস্ট তত্ত্ব কেবল তাকেই সাধারণ সূত্র রূপে প্রকাশ করে। প্রচলিত মালিকানা সম্পর্কের উচ্ছেদটা মোটেই কমিউনিজমের একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়।

ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সমস্ত মালিকানা সম্পর্কেও ঐতিহাসিক বদল ঘটেছে।

যেমন, ফরাসী বিপ্লব বুর্জোয়া মালিকানার অনুকূলে সামন্ত সম্পত্তির উচ্ছেদ করে।

সাধারণভাবে মালিকানার উচ্ছেদ নয়, বুর্জোয়া মালিকানার উচ্ছেদই কমিউনিজমের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক। কিন্তু শ্রেণী-বিরোধের উপর, অল্পলোকের দ্বারা বহুজনের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন এবং উৎপন্ন দখলী ব্যবস্থার চূড়ান্ত ও পূর্ণতম প্রকাশ হল আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানা।

এই অর্থে কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে এক কথায় প্রকাশ করা চলে: ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ।

আমাদের বিরুদ্ধে — কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে — অভিযোগ আনা হয়েছে যে, ব্যক্তিবিশেষের নিজ পরিশ্রমের ফল হিসাবে নিজস্ব সম্পত্তি অর্জনের অধিকারের আমরা উচ্ছেদ করতে চাই, বলা হয় যে, সকল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, কর্ম ও স্বাবলম্বনের মূলভিত্তি হল এই সম্পত্তি।

কষ্টলব্ধ, স্বাধিকৃত, স্বোপার্জিত সম্পত্তি! সামান্য কারিগর ও ক্ষুদে চাষীর সম্পত্তির কথাই কি বলা হচ্ছে, যে ধরনের সম্পত্তি ছিল বুর্জোয়া সম্পত্তির আগে? তাকে উচ্ছেদ করার কোন প্রয়োজন নেই; যন্ত্রশিল্পের বিকাশ ইতিমধ্যেই তাকে অনেকাংশে ধ্বংস করেছে, এখনও প্রতিদিন ধ্বংস করে চলেছে।

নাকি বলা হচ্ছে আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানার কথা?

কিন্তু মজুরি-শ্রম কি মজুরদের জন্য কোনো মালিকানা সৃষ্টি করে? একেবারেই না। সে সৃষ্টি করে পুঁজি, অর্থাৎ সেই ধরনের সম্পত্তি যা মজুরি-শ্রমকে শোষণ করে, নিত্য নতুন শোষণের জন্য নতুন নতুন মজুরি-শ্রমের সরবরাহ সৃষ্টির শর্ত ছাড়া যা বাড়তে পারে না। বর্তমান ধরনের এই মালিকানা পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিরোধের দুইটি দিকই পরীক্ষা করে দেখা যাক।

পুঁজিপতি হওয়া মানে উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে শুধু একটা ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক **প্রতিষ্ঠার** প্রয়োজন। পুঁজি একটা যৌথ সৃষ্টি; সমাজের অনেক লোকের মিলিত কাজের ফলে, এমন কি শেষ বিশ্লেষণে, সমাজের সকল লোকের মিলিত কর্মেই পুঁজিকে চালু করা যায়।

পুঁজি তাই ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক শক্তি।

কাজেই পুঁজিকে সাধারণ সম্পত্তিতে অর্থাৎ সমাজের সকল লোকের সম্পত্তিতে পরিণত করলে, তার দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয় না। মালিকানার সামাজিক রূপটাই কেবল বদলে যায়। তার শ্রেণীগত প্রকৃতিটা লোপ পায়।

এবার মজুরি-শ্রমের কথা ধরা যাক।

মজুরি-শ্রমের গড়পড়তা দাম হল নিম্নতম মজুরি, অর্থাৎ মেহনতী হিসাবে মেহনতীর মাত্র অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার জন্য যা একান্ত আবশ্যক, গ্রাসাচ্ছাদনের সেইটুকু উপকরণ। সুতরাং মজুরি-শ্রমিক শ্রম করে যেটুকু ভাগ পায় তাতে কেবল কোনোক্রমে এই অস্তিত্বটুকু চালিয়ে যাওয়া ও পুনরুৎপাদন করা চলে। শ্রমোৎপন্নের উপর এই ব্যক্তিগত দখলী, যা কেবল মানুষের প্রাণরক্ষা ও নতুন মানুষের জন্মদানের কাজে লাগে এবং অপরের পরিশ্রমের উপর কর্তৃত্ব চালাবার মতো কোনো উদ্বৃত্ত যার থাকে না, তেমন ব্যক্তিগত দখলীর উচ্ছেদ একেবারেই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল উচ্ছেদ চাই দখলীর এই শোচনীয় প্রকৃতিটার, যার ফলে শ্রমিক বাঁচে শুধু পুঁজি বাড়ানোর জন্য,- তাকে বাঁচতে হয় শাসক শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য যতটা প্রয়োজন ঠিক ততখানি পর্যন্ত।

বুর্জোয়া সমাজে জীবন্ত পরিশ্রম পূর্বসঞ্চিত পরিশ্রম বাড়াবার

উপায়মাত্র। কমিউনিস্ট সমাজে কিন্তু পূর্বসঞ্চিত পরিশ্রম শ্রমিকের অস্তিত্বকে উদারতর, সমৃদ্ধতর, উন্নততর করে তোলার উপায়।

সুতরাং বুর্জোয়া সমাজে বর্তমানের উপর আধিপত্য করে অতীত; কমিউনিস্ট সমাজে বর্তমান আধিপত্য করে অতীতের উপর। বুর্জোয়া সমাজে পুঁজি হল স্বাধীন, স্বতন্ত্র-সত্তা, কিন্তু জীবন্ত মানুষ হল পরাধীন, স্বতন্ত্র-সত্তাবিহীন।

অথচ এমন অবস্থার অবসানকেই বুর্জোয়ারা বলে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উচ্ছেদ! কথাটা সত্যই। বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ব, বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্য, বুর্জোয়া স্বাধীনতার উচ্ছেদই যে আমাদের লক্ষ্য তাতে সন্দেহ নেই।

উৎপাদনের বর্তমান বুর্জোয়া ব্যবস্থায় স্বাধীনতার অর্থ হল অবাধ বাণিজ্য, অবাধে বেচাকেনার অধিকার।

কিন্তু যদি বেচাকেনাই লোপ পায়, তবে অবাধ বেচাকেনাও অন্তর্ধান করবে। এই অবাধ বেচাকেনার কথাটা এবং সাধারণভাবে স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের বুর্জোয়াদের অন্য সব 'আস্ফালনের' যদি কোনো অর্থ থাকে তবে সে শুধু সীমাবদ্ধ কেনাবেচার সঙ্গে তুলনায়, মধ্যযুগীয় বাধাগ্রস্ত বণিকদের সঙ্গে তুলনায়; কেনাবেচার, উৎপাদনের বুর্জোয়া শর্ত ও খোদ বুর্জোয়া শ্রেণীটারই যে উচ্ছেদের কথা কমিউনিস্টরা বলে তার কাছে এগুলির কোনো অর্থ টেকে না।

আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনগণের শতকরা নব্বুই জনের ব্যক্তিগত মালিকানা তো ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে; অল্প কয়েকজনের ভাগ্যে সম্পত্তির একমাত্র কারণ হল ঐ দশ ভাগের নয় ভাগ লোকের হাতে কিছুই না থাকা। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ দাঁড়ায় এই যে সম্পত্তির অধিকারের এমন একটা রূপ আমরা তুলে দিতে চাই যা বজায় রাখার অনিবার্য শর্ত হল সমাজের বিপুল সংখ্যাধিক লোকের সম্পত্তি না থাকা।

এক কথায়, আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের অভিযোগ এই যে আপনাদের সম্পত্তির উচ্ছেদ আমরা চাই। ঠিক কথা, আমাদের সংকল্প ঠিক তা-ই।

যেই মানুষের পরিশ্রমকে আর পুঁজি, মুদ্রা, অথবা খাজনাতে পরিণত করা চলে না, একচেটিয়া কর্তৃত্বের মুঠির আয়ত্তাধীন একটা সামাজিক শক্তিতে

পরিণত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে — অর্থাৎ যেই নিজস্ব মালিকানা আর বুর্জোয়া মালিকানায়, পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে পারে না, তখনি আপনারা বলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শেষ হয়ে গেল।

তাহলে স্বীকার করুন যে 'ব্যক্তি' বলতে বুর্জোয়া ছাড়া, শুধু মধ্য শ্রেণীভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছাড়া অন্য লোক বোঝায় না। এহেন ব্যক্তিকে অবশ্যই পথ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিতে হবে, তার অস্তিত্ব করে তুলতে হবে অসম্ভব।

সমাজের উৎপন্ন জিনিসে দখলীর অধিকার থেকে কমিউনিজম কোনও লোককে বঞ্চিত করে না; দখলীর মাধ্যমে অপরের পরিশ্রমকে করায়ত্ত করার ক্ষমতাটাই সে কেবল হরণ করে।

আপত্তি উঠেছে যে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হলে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, সর্বব্যাপী আলস্য আমাদের অভিভূত করবে।

এই মত ঠিক হলে বহুপূর্বেই নিছক আলস্যের টানে বুর্জোয়া সমাজের রসাতলে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ ও সমাজে যারা খাটে তারা কিছু অর্জন করে না, আর যারা সবকিছু পায়, তাদের খাটতে হয় না। সমস্ত আপত্তিটাই অন্য ভাষায় এই পুনরুক্তির সামিল: যখন পুঁজি থাকবে না তখন মজুরি-শ্রমও অদৃশ্য হবে।

বৈষয়িক দ্রব্যের উৎপাদন ও দখলী বিষয়ে কমিউনিস্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধে যত আপত্তি আনা হয়, মানসিক সৃষ্টির উৎপাদন ও দখলী সম্পর্কে কমিউনিস্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধেও ঠিক সেই আপত্তি তোলা হয়। বুর্জোয়ার কাছে শ্রেণীগত মালিকানার উচ্ছেদটা যেমন উৎপাদনেরই অবসান বলে মনে হয়, তেমনি শ্রেণীগত সংস্কৃতির লোপ তার কাছে সকল সংস্কৃতি লোপ পাওয়ার সমার্থক।

যে সংস্কৃতির অবসান ভয়ে বুর্জোয়ারা বিলাপ করে, বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের কাছে তা যন্ত্র হিসাবে কাজ করার একটা তালিম মাত্র।

বুর্জোয়া মালিকানা উচ্ছেদে আমাদের সংকল্পের বিচারে যদি আপনারা স্বাধীনতা, সংস্কৃতি, আইন ইত্যাদির বুর্জোয়া ধারণার আশ্রয় নেন তাহলে আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে আসবেন না। আপনাদের ধারণাগুলিই যে আপনাদের বুর্জোয়া উৎপাদন ও বুর্জোয়া মালিকানার পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত, ঠিক যেমন আপনাদের শ্রেণীর ইচ্ছাটা সকলের উপর আইন হিসাবে

চাপিয়ে দেওয়াটাই হল আপনাদের আইনশাস্ত্র, আপনাদের এ ইচ্ছাটার মূল প্রকৃতি ও লক্ষ্যও আবার নির্ধারিত হচ্ছে আপনাদের শ্রেণীরই অস্তিত্বের অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা।

আপনাদের বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি ও সম্পত্তির রূপ থেকে যে সামাজিক রূপ মাথা তোলে, ঐতিহাসিক এই যে সম্পর্ক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদয় ও লয় পায়, আত্মপর বিভ্রান্তির ফলে আপনারা তাকে প্রকৃতি ও বিচারবুদ্ধির চিরন্তন নিয়মে রূপান্তরিত করতে চান, আপনাদের আগে যত শাসক শ্রেণী এসেছে তাদের সকলেরই ছিল অনুরূপ বিভ্রান্তি। প্রাচীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে কথাটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার, সামন্ত সম্পত্তির বেলায় যা আপনারা মেনে নেন, আপনাদের নিজস্ব বুর্জোয়া ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই সে কথা আপনাদের স্বীকার করা বারণ।

পরিবারের উচ্ছেদ! উগ্র চরমপন্থীরা পর্যন্ত কমিউনিস্টদের এই গর্হিত প্রস্তাবে ক্ষেপে ওঠে।

আধুনিক পরিবার অর্থাৎ বুর্জোয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠা কোন ভিত্তির উপর? সে ভিত্তি হল পুঁজি, ব্যক্তিগত লাভ। এই পরিবারের পূর্ণ বিকশিত রূপটি শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু এই অবস্থারই অনুপূরণ দেখা যাবে প্রলেতারীয়দের পক্ষে পরিবারের কার্যত অনুপস্থিতিতে এবং প্রকাশ্য পতিতাবৃত্তির ভিতর।

অনুপূরক এই অবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া পরিবারের লোপও অবশ্যম্ভাবী, পুঁজির উচ্ছেদের সঙ্গেই আসবে উভয়ের অন্তর্ধান।

আমাদের বিরুদ্ধে কি এই অভিযোগ যে সন্তানের উপর পিতামাতার শোষণ শেষ করে দিতে চাই? এ দোষ আমরা অস্বীকার করব না।

কিন্তু আপনারা বলবেন যে আমরা সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্ক ধ্বংস করে দিই যখন আমরা পারিবারিক শিক্ষার স্থানে বসাই সামাজিক শিক্ষাকে।

আর আপনাদের শিক্ষাটা! সেটাও কি সামাজিক নয়? সামাজিক যে অবস্থার আওতায় শিক্ষাদান চলে তা দিয়ে, সমাজের সাক্ষাৎ কিংবা অপ্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ মারফত, স্কুল ইত্যাদির মাধ্যমে কি সে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয় না? শিক্ষা ব্যাপারে সমাজের হস্তক্ষেপ কমিউনিস্টদের উদ্ভাবন নয়; তারা চায় শুধু হস্তক্ষেপের প্রকৃতিটা বদলাতে, শাসক শ্রেণীর প্রভাব থেকে শিক্ষাকে উদ্ধার করতে।

আধুনিক যন্ত্রশিল্পের ক্রিয়ায় মজুরদের মধ্যে সকল পারিবারিক বন্ধন যত বেশি মাত্রায় ছিন্ন হতে থাকে, তাদের ছেলেমেয়েরা যত বেশি করে সামান্য কেনাবেচার বস্তু ও পরিশ্রমের হাতিয়ারে পরিণত হতে থাকে, ততই পরিবার ও শিক্ষা বিষয়ে বাপ-মার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পবিত্র সম্বন্ধ বিষয়ে বুর্জোয়াদের বাগাড়ম্বর ঘৃণ্য হয়ে ওঠে।

সমস্ত বুর্জোয়া শ্রেণী সমস্বরে চীৎকার করে বলে — কিন্তু তোমরা কমিউনিস্টরা যে মেয়েদের সাধারণ সম্পত্তি করে ফেলতে চাও।

বুর্জোয়া নিজের স্ত্রীকে নিতান্ত উৎপাদনের হাতিয়ার হিসাবেই দেখে থাকে। তাই যখন সে শোনে যে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি সমবেতভাবে ব্যবহার করার কথা উঠেছে, তখন স্বভাবতই মেয়েদের ভাগ্যেও তেমনি সকলের ভোগ্য হতে হবে, এছাড়া আর কোনও সিদ্ধান্তে সে আসতে পারে না।

ঘৃণাক্ষরেও তার মনে সন্দেহ জাগে না যে আসল লক্ষ্য হল উৎপাদনের হাতিয়ার মাত্র হয়ে থাকার দশা থেকে মেয়েদের মুক্তিসাধন।

তাছাড়া, মেয়েদের উপর এই সাধারণ অধিকারটা কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে এই ভান করে আমাদের বুর্জোয়ারা যে এত ধর্মক্রোধ দেখায় তার চেয়ে হাস্যাস্পদ আর কিছু নেই। মেয়েদের সাধারণ সম্পত্তি করার প্রয়োজন কমিউনিস্টদের নেই; প্রায় স্মরণাতীতকাল থেকে সে প্রথার প্রচলন আছে।

সামান্য বেশ্যার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই হল, মজুরদের স্ত্রী-কন্যা হাতে পেয়েও আমাদের বুর্জোয়ারা সন্তুষ্ট নয়, পরস্পরের স্ত্রীকে ফুসলে আনাতেই তাদের পরম আনন্দ।

বুর্জোয়া বিবাহ হল আসলে অনেকে মিলে সাধারণ স্ত্রী রাখার ব্যবস্থা। সুতরাং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বড় জোর এই বলে অভিযোগ আনা সম্ভব যে ভণ্ডামির আড়ালে মেয়েদের উপর সাধারণ যে অধিকার লুকানো রয়েছে সেটাকে এরা প্রকাশ্য আইনসম্মত রূপ দিতে চায়। এটুকু ছাড়া এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতি লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত মেয়েদের উপর সাধারণ অধিকারেরও অবসান আসবে, অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপন দুই ধরনের বেশ্যাবৃত্তিই শেষ হয়ে যাবে।

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে তারা চায় স্বদেশ ও জাতিসত্তার বিলোপ।

মেহনতীদের দেশ নেই। তাদের যা নেই তা আমরা কেড়ে নিতে পারি না। প্রলেতারিয়েতকে যেহেতু সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, দেশের পরিচালক শ্রেণীর পদে উঠতে হবে, নিজেকেই জাতি হয়ে উঠতে হবে, তাই সেদিক থেকে প্রলেতারিয়েত নিজেই জাতি, যদিও কথাটার বুর্জোয়া অর্থে নয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, জগৎজোড়া বাজার, উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তার অনুগামী জীবনযাত্রার ধরনে একটা সার্বজনীন ভাব — এই সবের জন্যই জাতিগত পার্থক্য ও জাতিবিরোধ দিনের পর দিন ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য তাদের আরও দ্রুত অবসানের কারণ হবে। প্রলেতারিয়েতের মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্তই হল মিলিত প্রচেষ্টা, অন্তত অগ্রণী সভ্য দেশগুলির মিলিত প্রচেষ্টা।

যে পরিমাণে ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির শোষণ শেষ করা যাবে, সেই অনুপাতে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির শোষণটাও বন্ধ হয়ে আসবে। যে পরিমাণে জাতির মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ শেষ হবে, সেই অনুপাতে এক জাতির প্রতি অন্য জাতির শত্রুতাও মিলিয়ে যাবে।

ধর্ম, দর্শন এবং সাধারণ ভাবাদর্শের দিক থেকে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয় তা গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হবারও যোগ্য নয়।

মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজ জীবনের প্রতিটি বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা, মতামত ও বিশ্বাস, এক কথায় মানুষের চেতনা যে বদলে যায়, এ কথা বুঝতে কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাগে?

বৈষয়িক উৎপাদন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে মানসিক সৃষ্টির প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে, এছাড়া চিন্তার ইতিহাস আর কী প্রমাণ করে? প্রতি যুগেই যে সব ধারণা আধিপত্য করেছে তারা চিরকালই তখনকার শাসক শ্রেণীরই ধারণা।

লোকে যখন এমন ধারণার কথা বলে যা সমাজে বিপ্লব আনছে, তখন শুধু এই সত্যই প্রকাশ করা হয় যে পুরানো সমাজের মধ্যে নতুন এক সমাজের উপাদান সৃষ্টি হয়েছে, এবং অস্তিত্বের পুরানো অবস্থার ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো ধারণার বিলোপ তাল রেখে চলছে।

প্রাচীন জগতের যখন অন্তিম অবস্থা, তখনই খৃষ্টান ধর্ম পুরানো

ধর্মগুলিকে পরাস্ত করেছিল। খৃষ্টান ধারণা যখন আঠারো শতকে যুক্তিবাদী ধারণার কাছে হার মানে তখন সামন্ত সমাজেরও মৃত্যু সংগ্রাম চলেছিল সেদিনের বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে। ধর্মমতের স্বাধীনতা, বিবেকের মুক্তি শুধু জ্ঞানের রাজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার আধিপত্যটাকেই রূপ দিল।

বলা হবে যে 'ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহে ধর্মীয়, নৈতিক, দার্শনিক এবং আইনী ধারণাগুলিতে পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সে পরিবর্তন সত্ত্বেও নিয়ত টিকে থেকেছে ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন, রাজনীতি ও আইন।

'তাছাড়া স্বাধীনতা, ন্যায় ইত্যাদি চিরন্তন সত্য আছে, সমাজের সকল অবস্থাতেই তারা বিদ্যমান। কিন্তু কমিউনিজম চিরন্তন সত্যকেই উড়িয়ে দেয়, ধর্ম ও নৈতিকতাকে নতুন ভিত্তিতে পুনর্গঠিত না করে তা সব ধর্ম ও সব নৈতিকতারই উচ্ছেদ করে; তাই তা ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।'

এই অভিযোগ কোথায় এসে দাঁড়ায়? সকল অতীত সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণী-বিরোধের বিকাশ, বিভিন্ন যুগে সে বিরোধ ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

কিন্তু যে রূপই নিক একটা ব্যাপার অতীতের সকল যুগেই বর্তমান যথা, সমাজের এক অংশ কর্তৃক অপর অংশকে শোষণ। তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে অতীত যুগের সামাজিক চেতনায় যত বিভিন্নতা ও বিচিত্রতাই প্রকাশ পাক না কেন, তা কয়েকটি নির্দিষ্ট সাধারণ রূপ বা সাধারণ ধারণার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে, শ্রেণী-বিরোধের সম্পূর্ণ লুপ্তির আগে তা পুরোপুরি অদৃশ্য হতে পারে না।

কমিউনিস্ট বিপ্লব হল চিরাচরিত সম্পত্তি সম্পর্কের সঙ্গে একেবারে আমূল বিচ্ছেদ; এই বিপ্লবের বিকাশে যে চিরাচরিত ধারণার সঙ্গেও একেবারে আমূল একটা বিচ্ছেদ নিহিত, তাতে আর আশ্চর্য কি।

কিন্তু কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া আপত্তির প্রসঙ্গ যাক।

আগে আমরা দেখেছি যে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবে প্রথম ধাপ হল প্রলেতারিয়েতকে শাসক শ্রেণীর পদে উন্নীত করা, গণতন্ত্রের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করা।

বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নেওয়ার জন্য, রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের

সমস্ত উপকরণ কেন্দ্রীভূত করার জন্য এবং উৎপাদন-শক্তির মোট সমষ্টিটাকে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করবে।

শুরুতে অবশ্যই সম্পত্তির অধিকার এবং বুর্জোয়া উৎপাদন পরিস্থিতির উপর স্বৈরাচারী আক্রমণ ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না; সুতরাং তা করতে হবে এমন সব ব্যবস্থা মারফত যা অর্থনীতির দিক থেকে অপর্যাপ্ত ও অযৌক্তিক মনে হবে, কিন্তু যাত্রাপথে এরা নিজ সীমা ছাড়িয়ে যাবে এবং পুরানো সমাজ ব্যবস্থার উপর আরও আক্রমণ প্রয়োজনীয় করে তুলবে; উৎপাদন-পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপ্লবীকরণের উপায় হিসাবে যা অপরিহার্য।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবশ্যই এই ব্যবস্থাগুলি হবে বিভিন্ন।

তাসত্ত্বেও সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি মোটের ওপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য:

১। জমি মালিকানার অবসান; জমির সমস্ত খাজনা জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয়।

২। উচ্চমাত্রার ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর।

৩। সবরকমের উত্তরাধিকার বিলোপ।

৪। সমস্ত দেশত্যাগী ও বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।

৫। রাষ্ট্রীয় পুঁজি ও নিরঙ্কুশ একচেটিয়া সহ একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক মারফত সমস্ত ক্রেডিট রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৬। যোগাযোগ ও পরিবহনের সমস্ত উপায় রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৭। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কলকারখানা ও উৎপাদন-উপকরণের প্রসার; পতিত জমির আবাদ এবং এক সাধারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র জমির উন্নতিসাধন।

৮। সকলের পক্ষে সমান শ্রমবাধ্যতা। শিল্পবাহিনী গঠন, বিশেষত কৃষিকার্যের জন্য।

৯। কৃষিকার্যের সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের সংযুক্তি; সারা দেশের জনসংখ্যার আরো বেশি সমভাবে বণ্টন মারফত ক্রমে ক্রমে শহর ও গ্রামের প্রভেদ লোপ।

১০। সরকারী বিদ্যালয়ে সকল শিশুর বিনা খরচে শিক্ষা। ফ্যাক্টরিতে বর্তমান ধরনের শিশু শ্রমের অবসান। শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার সংযুক্তি ইত্যাদি।

বিকাশের গতিপথে যখন শ্রেণী-পার্থক্য অদৃশ্য হয়ে যাবে, সমস্ত উৎপাদন যখন গোটা জাতির এক বিপুল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হবে, তখন সরকারী (পাবলিক) শক্তির রাজনৈতিক চরিত্র আর থাকবে না। সঠিক অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা হল এক শ্রেণীর উপর অত্যাচার চালাবার জন্য অপর শ্রেণীর সংগঠিত শক্তি মাত্র। বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে লড়াই-এর ভিতর অবস্থার চাপে যদি প্রলেতারিয়েত নিজেকে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করতে বাধ্য হয়, বিপ্লবের মাধ্যমে তারা যদি নিজেদের শাসক শ্রেণীতে পরিণত করে ও শাসক শ্রেণী হিসাবে উৎপাদনের পুরাতন ব্যবস্থাকে তারা যদি ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, তাহলে সেই পুরানো অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-বিরোধ তথা সবরকম শ্রেণীর অস্তিত্বটাই দূর করে বসবে এবং তাতে করে শ্রেণী হিসাবে তাদের স্বীয় আধিপত্যেরও অবসান ঘটাবে।

শ্রেণী ও শ্রেণী-বিরোধ সংবলিত পুরানো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এক সমিতি যার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকেরই স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত।

সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট সাহিত্য

১। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র

ক। সামন্ত সমাজতন্ত্র

স্বীয় ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কারণে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের অভিজাতদের কাছে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লেখা একটা কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসের ফরাসী বিপ্লবে এবং ইংলণ্ডে সংস্কার আন্দোলনে ঘৃণ্য ভুঁইফোড়দের হাতে এদের আবার পরাভব হল। এরপর এদের পক্ষে একটা গুরুতর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালানোর কথাই ওঠে না। সম্ভব রইল একমাত্র মসীযুদ্ধ। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রেস্টোরেশন (restoration)* যুগের পুরানো ধ্বনিগুলি তখন অচল হয়ে পড়েছে।

লোকের সহানুভূতি উদ্রেকের জন্য অভিজাতেরা বাধ্য হল বাহ্যত নিজেদের স্বার্থ ভুলে কেবল শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থেই বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ খাড়া করতে। এইভাবে অভিজাতেরা প্রতিশোধ নিতে লাগল তাদের নতুন প্রভুদের নামে টিটকারি দিয়ে, তাদের কানে কানে আসন্ন প্রলয়ের ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে।

এইভাবে উদয় হয় সামন্ত সমাজতন্ত্রের: তার অর্ধেক বিলাপ আর অর্ধেক টিটকারি; অর্ধেক অতীতের প্রতিধ্বনি এবং অর্ধেক ভবিষ্যতের হুমকি; মাঝে মাঝে এদের তিক্ত, সব্যঙ্গ ও সুতীক্ষ্ম সমালোচনা বুর্জোয়াদের মর্মে গিয়ে বিঁধত; অথচ আধুনিক ইতিহাসের অগ্রগমন বোধের একান্ত অক্ষমতায় মোট ফলটা হত হাস্যকর।

---

* ১৬৬০ থেকে ১৬৮৯ সালের ইংরেজী রেস্টোরেশন নয়, ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সালের ফরাসী রেস্টোরেশন। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

জনগণকে দলে টানার জন্য অভিজাতবর্গ নিশান হিসাবে তুলে ধরত মজুরের ভিক্ষার থলিটাকে। লোকেরা কিন্তু যতবারই দলে ভিড়েছে ততবারই এদের পিছনদিকটায় সামন্ত দরবারী চাপরাশ দেখে হো হো করে অশ্রদ্ধার হাসি হেসে ভেগে গেছে।

এ প্রহসনটা দেখায় ফরাসী লেজিটিমিস্টদের একাংশ এবং 'নবীন ইংলণ্ড' গোষ্ঠী। (৬)

বুর্জোয়া শোষণ থেকে তাদের শোষণ পদ্ধতি অন্য ধরনের ছিল এটা দেখাতে গিয়ে সামন্তপন্থীরা মনে রাখে না যে সম্পূর্ণ পৃথক পরিস্থিতি ও অবস্থায় তাদের শোষণ চলত, যা আজকের দিনে অচল হয়ে পড়েছে। তাদের আমলে আজকালকার প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বই ছিল না দেখাতে গিয়ে তারা ভুলে যায় যে তাদের নিজস্ব সমাজেরই অনিবার্য সন্তান হল আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণী।

তা ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে নিজেদের সমালোচনার প্রতিক্রিয়াশীল রূপটা এরা এত কম ঢাকে যে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এদের প্রধান অভিযোগ দাঁড়ায় এই যে, বুর্জোয়া রাজত্বে এমন এক শ্রেণী গড়ে উঠছে, সমাজের পুরানো ব্যবস্থাকে আগাগোড়া নির্মূল করাই যার নির্বন্ধ।

বুর্জোয়া শ্রেণী প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করছে তার জন্য তত নয়, **বিপ্লবী** প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করছে এটাই হল এদের অভিযোগ।

সুতরাং রাজনীতির কার্যক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দমনের সকল ব্যবস্থায় এরা যোগ দেয়; আর সাধারণ জীবনযাত্রায় বড় বড় বুলি সত্ত্বেও যন্ত্রশিল্পরূপ গাছের সোনার ফল কুড়িয়ে নিতে এদের আপত্তি নেই; পশম, বীটচিনি, অথবা আলুর মদের* ব্যবসার জন্য সত্য, প্রেম, মর্যাদা বেচতে এদের দ্বিধা হয় না।

---

* কথাটা বিশেষ করে জার্মানি সম্বন্ধে খাটে। সেখানে অভিজাত ভূস্বামী ও জমিদাররা বড় বড় মহাল নিজেরাই গোমস্তা রেখে চাষ করায়, তা ছাড়া নিজেরাই ব্যাপকভাবে বীটচিনি ও আলুর মদ তৈরি করে। এদের চেয়ে অবস্থাপন্ন ইংরেজ অভিজাতেরা এখনও ঠিক এতটা নামে নি; কিন্তু তারাও কমতি খাজনার ক্ষতিপূরণের জন্য কমবেশী সন্দেহজনক জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি পত্তন করার কাজে নিজেদের নাম ধার দিতে জানে। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

জমিদারের সঙ্গে পুরোহিত যেমন সর্বদাই হাত মিলিয়ে চলেছে, তেমনি সামন্ত সমাজতন্ত্রের সঙ্গে জুটেছে পাদরিদের সমাজতন্ত্র।

খৃষ্টানী কৃচ্ছ্রসাধনাকে সমাজতন্ত্রী রং দেওয়ার চেয়ে সহজ কিছু নেই। খৃষ্টান ধর্ম ব্যক্তিগত মালিকানা, বিবাহ ও রাষ্ট্রকে ধিক্কার দেয় নি কি? তার বদলে দয়া ও দারিদ্র্য, ব্রহ্মচর্য ও ইন্দ্রিয়দমন, মঠব্যবস্থা ও গির্জার প্রচার করে নি কি তারা? যে পুণ্যোদকে পুরোহিতেরা অভিজাতদের হৃদয়জ্বালাকে পবিত্র করে থাকে তারই নাম খৃষ্টান সমাজতন্ত্র।

খ। পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র

বুর্জোয়াদের হাতে একমাত্র সামন্ত অভিজাত শ্রেণীরই সর্বনাশ হয় নি, তারাই একমাত্র শ্রেণী নয় আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের আবহাওয়ায় যাদের অস্তিত্ব-শর্ত শুকিয়ে গিয়ে মরতে বসেছে। আধুনিক বুর্জোয়াদের অগ্রদূত ছিল মধ্যযুগের নাগরিক দল এবং ছোটো ছোটো খোদকস্ত চাষী। শিল্প বাণিজ্যে যে সব দেশের বিকাশ অতি সামান্য, সেখানে উঠন্ত বুর্জোয়াদের পাশাপাশি এখনো এই দুই শ্রেণী দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে।

আধুনিক সভ্যতা যে সব দেশে সম্পূর্ণ বিকশিত সেখানে আবার পেটি বুর্জোয়ার নতুন এক শ্রেণী উদ্ভব হয়েছে, প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মাঝখানে এরা দোলায়িত, বুর্জোয়া সমাজের আনুষঙ্গিক একটা অংশ হিসাবে বারবার নতুন হয়ে উঠছে এরা। এই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন লোক কিন্তু প্রতিযোগিতার চাপে ক্রমাগতই প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, বর্তমান যন্ত্রশিল্পের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এরা এমন কি এও দেখে যে সময় এগিয়ে আসছে যখন আধুনিক সমাজের স্বাধীন স্তর হিসাবে এদের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাবে; শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে এদের স্থান দখল করবে তদারককারী কর্মচারী, গোমস্তা, অথবা দোকান কর্মচারী।

ফ্রান্সের মতো দেশে, যেখানে চাষীরা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের অনেক বেশি, সেখানে যে-লেখকেরা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে মজুরের দলে যোগ দিয়েছে তারা যে বুর্জোয়া রাজত্বের সমালোচনায় কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া মানদণ্ডের আশ্রয় নেবে, এই মধ্যবর্তী শ্রেণীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শ্রমিক শ্রেণীর

পক্ষে অস্ত্র ধারণ করবে তা স্বাভাবিক। পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের উদয় হয় এইভাবে। এ দলের নেতা হলেন সিসমন্দি, শুধু ফ্রান্সে নয়, ইংলণ্ডেও।

আধুনিক উৎপাদন পরিস্থিতির অভ্যন্তরস্থ স্ববিরোধগুলিকে সমাজতন্ত্রের এই দলটি অতি তীক্ষ্নভাবে উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছে। অর্থনীতিবিদদের ভণ্ড কৈফিয়তের স্বরূপ ফাঁস করেছে এরা। তারা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ করেছে যন্ত্র ও শ্রমবিভাগের মারাত্মক ফলাফল, অল্প কয়েকজনের হাতে পুঁজি ও জমির কেন্দ্রীভবন, অতি উৎপাদন ও সংকট, পেটি বুর্জোয়া ও চাষীর অনিবার্য সর্বনাশ, প্রলেতারিয়েতের দুর্দশা ও উৎপাদনে অরাজকতা, ধন বণ্টনের তীব্র অসমতা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের ধ্বংসাত্মক শিল্প লড়াই, সাবেকী নৈতিক বন্ধন, পুরানো পারিবারিক সম্বন্ধ এবং পুরাতন জাতিসত্তার ভাঙনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে তারা।

ইতিবাচক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু সমাজতন্ত্রের এই রূপটি হয় উৎপাদন ও বিনিময়ের পুরানো উপায় ও সেই সঙ্গে সাবেকী সম্পত্তি-সম্পর্ক ও পুরাতন সমাজ ফিরিয়ে আনতে, নয় উৎপাদন ও বিনিময়ের নতুন উপায়কে সম্পত্তি-সম্পর্কের সেই পুরানো কাঠামোর মধ্যেই আড়ষ্ট করে আটকে রাখতে সচেষ্ট, যা এই সব নতুন উপায়ের চাপে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, হওয়া অনিবার্য। উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রতিক্রিয়াশীল ও ইউটোপীয়।

এর শেষ কথা হল: শিল্পোৎপাদনের জন্য সংঘবদ্ধ গিল্‌ড্‌ প্রতিষ্ঠান, কৃষিকার্যে পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক।

শেষ পর্যন্ত যখন ইতিহাসের কঠোর সত্যে আত্মবিভ্রান্তির সমস্ত নেশা কেটে যায় তখন সমাজতন্ত্রের এ রূপটার অবসান হয় একটা শোচনীয় নাকিকান্নায়।

গ। জার্মান অথবা 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র

ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল ক্ষমতাধর বুর্জোয়া শ্রেণীর চাপে এবং এই ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিব্যক্তি হিসাবে। জার্মানিতে সে সাহিত্যের আমদানি হল যখন সামন্ত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেখানকার বুর্জোয়ারা সবেমাত্র লড়াই শুরু করেছে।

জার্মান দার্শনিকেরা, হবু দার্শনিকেরা, সৌখীন ভাবুকেরা (beaux esprits) সাগ্রহে এ সাহিত্য নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করল। তারা শুধু এই কথাটুকু ভুলে গেল যে ফ্রান্স থেকে এ ধরনের লেখা জার্মানিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সমাজ পরিস্থিতিও চলে আসে নি। জার্মানির সামাজিক অবস্থার সংস্পর্শে এসে এই ফরাসী সাহিত্যের সমস্ত প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক তাৎপর্য হারিয়ে গেল, তার চেহারা হল নিছক সাহিত্যিক। তাই আঠারো শতকের জার্মান দার্শনিকদের কাছে প্রথম ফরাসী বিপ্লবের দাবিগুলি মনে হল সাধারণভাবে 'ব্যবহারিক প্রজ্ঞার' (Practical Reason) দাবি মাত্র, এবং বিপ্লবী ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর অভিপ্রায় ঘোষণার তাৎপর্য দাঁড়াল বিশুদ্ধ অভিপ্রায়, অনিবার্য অভিপ্রায়, সাধারণভাবে যথার্থ মানবিক অভিপ্রায়ের আইন।

জার্মান লেখকদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল নতুন ফরাসী ধারণাগুলিকে নিজেদের সনাতন দার্শনিক চেতনার সঙ্গে খাপ খাওয়ান, নিজেদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ না করে ফরাসী ধারণাগুলিকে আত্মসাৎ করা।

যেভাবে বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করা হয় সেইভাবে, অর্থাৎ অনুবাদের মাধ্যমে এই আত্মসাতের কাজ চলেছিল।

প্রাচীন পেগান জগতের চিরায়ত সাহিত্যের পুঁথিগুলির **উপরেই** সন্ন্যাসীরা কী ভাবে ক্যাথলিক সাধুদের নির্বোধ জীবনী লিখে রাখত সে কথা সুবিদিত। অপবিত্র ফরাসী সাহিত্যের ব্যাপারে জার্মান লেখকেরা এ পদ্ধতিটিকে উল্টে দেয়। মূল ফরাসীর তলে তারা লিখল তাদের দার্শনিক ছাইপাঁশ। উদাহরণস্বরূপ, মুদ্রার অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ফরাসী সমালোচনার তলে তারা লিখল 'মানবতার বিচ্ছেদ'; বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ফরাসী সমালোচনার নিচে লিখে রাখল 'নির্বিশেষ এই প্রত্যয়ের সিংহাসনচ্যুতি' ইত্যাদি।

ফরাসী ঐতিহাসিক সমালোচনার পিছনে এই সব দার্শনিক বুলি জুড়ে দিয়ে তার নাম তারা দেয় 'কর্মযোগের দর্শন', 'খাঁটি সমাজতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্রের জার্মান বিজ্ঞান', 'সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি' ইত্যাদি।

ফরাসী সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট রচনাগুলিকে এইভাবে পুরোপুরি নির্বীর্য করে তোলা হয়। জার্মানদের হাতে যখন এ সাহিত্য এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর সংগ্রামের অভিব্যক্তি হয়ে আর রইল না, তখন তাদের ধারণা হল যে 'ফরাসী একদেশদর্শিতা' অতিক্রম করা গেছে, সত্যকার প্রয়োজন

নয় প্রকাশ করা গেছে সত্যের প্রয়োজনকে, প্রতিনিধিত্ব করা গেছে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের নয় মানব প্রকৃতির, নির্বিশেষ যে মানুষের শ্রেণী নেই, বাস্তবতা নেই, যার অস্তিত্ব কেবল দার্শনিক জল্পনার কুয়াশাবৃত রাজ্যে তার স্বার্থের।

জার্মান এই যে সমাজতন্ত্র তার স্কুলছাত্রের কর্তব্যটাকেই অমন গুরুগম্ভীর ভারিক্কী চালে গ্রহণ করে সামান্য পশরাটা নিয়েই ক্যানভাসারের মতো গলাবাজি শুরু করেছিল তার পান্ডিতি সারল্যটাও কিন্তু ইতিমধ্যে ক্রমে ক্রমে ঘুচে গেছে।

সামন্ত আভিজাত্য ও নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের বিপক্ষে জার্মান, বিশেষ করে প্রাশিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণীর লড়াইটা, অর্থাৎ উদারনৈতিক আন্দোলন তখন গুরুতর হয়ে ওঠে।

তাতে করে রাজনৈতিক আন্দোলনের সামনে সমাজতন্ত্রের দাবিগুলি তুলে ধরবার বহুবাঞ্ছিত সুযোগ 'খাঁটি' সমাজতন্ত্রের কাছে এসে হাজির হয়, হাজির হয় উদারনীতি, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, বুর্জোয়া প্রতিযোগিতা, সংবাদপত্রের বুর্জোয়া স্বাধীনতা, বুর্জোয়া বিধান, বুর্জোয়া মুক্তি ও সাম্যের বিরুদ্ধে চিরাচরিত অভিশাপ হানবার সুযোগ; জনগণের কাছে এই কথা প্রচারের সুযোগ যে এই বুর্জোয়া আন্দোলন থেকে তাদের লাভের কিছু নেই, সবকিছু হারাবারই সম্ভাবনা। ঠিক সময়টিতেই জার্মান সমাজতন্ত্র ভুলে গেল, যে-ফরাসী সমালোচনার সে মূঢ় প্রতিধ্বনি মাত্র সেখানে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্ব আগেই প্রতিষ্ঠিত, আর তার সঙ্গে ছিল অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও তদুপযোগী রাজনৈতিক সংবিধান, অথচ জার্মানিতে আসন্ন সংগ্রামের লক্ষ্যই ছিল ঠিক এইগুলিই।

পুরোহিত, পণ্ডিত, গ্রাম্য জমিদার, আমলা ইত্যাদি অনুচর সহ জার্মান স্বৈর সরকারগুলির কাছে আক্রমণোদ্যত বুর্জোয়া শ্রেণীকে ভয় দেখাবার চমৎকার জুজু হিসাবে তা কাজে লাগল।

ঠিক একই সময়ে এই সরকারগুলি জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহসমূহকে চাবুক ও গুলির যে তিক্ত ওষুধ গেলাচ্ছিল তার মধুরেণ সমাপয়েৎ হল এতে।

এই 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র একদিকে এইভাবে সরকারগুলির কাজে লাগছিল জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়ার হাতিয়ার হিসাবে, আর সেইসঙ্গেই তা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ, জার্মানির কূপমণ্ডূকদের স্বার্থের প্রতিনিধি।

জার্মানিতে প্রচলিত অবস্থার প্রকৃত সামাজিক ভিত্তি ছিল **পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী**, ষোলো শতকের এই ভগ্নশেষটি তখন থেকে নানা মূর্তিতে বারবার আবির্ভূত হয়েছে।

এ শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ হল জার্মানির বর্তমান অবস্থাটাকেই জিইয়ে রাখা। বুর্জোয়া শ্রেণীর শিল্পগত ও রাজনৈতিক আধিপত্যে এ শ্রেণীর নির্ঘাত ধ্বংসের আশঙ্কা — একদিকে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে, অপরদিকে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের অভ্যুদয়ে। মনে হল যেন এই দুই পাখিকে এক ঢিলেই মারতে পারবে 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র। মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ল তা।

জল্পনাকল্পনার মাকড়সার জালের পোশাক, তার উপর বাক্যালঙ্কারের নক্সী ফুল, অসুস্থ ভাবালুতার রসে সিক্ত এই যে স্বর্গীয় আচ্ছাদনে জার্মান সমাজতন্ত্রীরা তাদের অস্থিচর্মসার শোচনীয় 'চিরন্তন সত্য' দুটোকে সাজিয়ে দিল, তাতে এই ধরনের লোকসমাজে তাদের মালের অসম্ভব কাটতি বাড়ে।

কূপমণ্ডূক পেটি বুর্জোয়ার বাগাড়ম্বরী প্রতিনিধিত্বটাই তার কাজ, জার্মান সমাজতন্ত্র নিজের দিক থেকে তা ক্রমেই বেশি করে উপলব্ধি করতে থাকে।

তারা ঘোষণা করল যে জার্মান জাতি হল আদর্শ জাতি, কূপমণ্ডূক জার্মান মধ্যবিত্তই হল আদর্শ মানুষ। এই আদর্শ মানুষের প্রতিটি শয়তানী নীচতার এরা এক একটা গূঢ় মহত্তর সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিল, যা তার আসল প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। এমন কি কমিউনিজমের 'পাশবিক ধ্বংসাত্মক' ঝোঁকের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা ও সব ধরনের শ্রেণী-সংগ্রাম সম্বন্ধে পরম ও নিরপেক্ষ অবজ্ঞা ঘোষণায় তার দ্বিধা হল না। আজকের দিনে (১৮৪৭) যত তথাকথিত সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট রচনা জার্মানিতে প্রচলিত, যৎসামান্য কয়েকটিকে বাদ দিলে তার সমস্তটাই এই কলুষিত ক্লান্তিকর সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।*

---

* ১৮৪৮ সালের বিপ্লবী ঝড় এই সমগ্র নোংরা ঝোঁকটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়ে, সমাজতন্ত্র নিয়ে আরও কিছু জল্পনার বাসনাটুকুও ঘুচিয়ে দিয়েছে এর প্রবক্তাদের। এই ঝোঁকের প্রধান প্রতিভূ ও ক্লাসিকাল প্রতিচ্ছবি হলেন কার্ল গ্রুন মহাশয়। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

২। রক্ষণশীল অথবা বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র

বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটা ক্রমাগত বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশ সামাজিক অভাব-অভিযোগের প্রতিকার চায়।

এই অংশের মধ্যে পড়ে অর্থনীতিবিদেরা, লোকহিতব্রতীরা, মানবতাবাদীরা, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নয়নকারীরা, দুঃস্থ-ত্রাণ সংগঠকেরা, পশুক্লেশ নিবারণী সভার সদস্যরা, মাদকতা নিবারণের গোঁড়া প্রচারকেরা, সম্ভবপর সবরকম ধরনের খুচরো সংস্কারকরা। সমাজতন্ত্রের এই রূপটি পরিপূর্ণ মতধারা হিসাবেও সংরচিত হয়ে উঠেছে।

এই রূপটার নিদর্শন হিসাবে আমরা প্রুধোঁ-র 'দারিদ্র্যের দর্শন'এর উল্লেখ করতে পারি।

সমাজতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা আধুনিক সামাজিক অবস্থার সুবিধাটা পুরোপুরি চায়, চায় না তৎপ্রসূত অবশ্যম্ভাবী সংগ্রাম ও বিপদটুকু। তারা সমাজের বর্তমান অবস্থা বজায় রাখতে চায়, কিন্তু তার বিপ্লবী ও ধ্বংসকারী উপাদানসমূহ বাদ দিয়ে। তারা চায় প্রলেতারিয়েতবিহীন বুর্জোয়া শ্রেণী। যে-দুনিয়ায় তারা সর্বেসর্বা, স্বভাবতই সেই দুনিয়াই তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রীতিকর প্রত্যয়টিকেই বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র ন্যূনাধিক পরিপূর্ণ নানাবিধ মতবাদে দাঁড় করায়। এরূপ মতবাদ কাজে পরিণত করে প্রলেতারিয়েত সামাজিক নব জেরুজালেমে যাক, এই বলে এরা আসলে এটাই চায় যে শ্রমিক শ্রেণী বর্তমান সমাজের চৌহদ্দির ভিতরেই থাকুক, কিন্তু বুর্জোয়া সম্বন্ধে তার সমস্ত বিদ্বেষভাব বিসর্জন দিক।

এই ধরনের সমাজতন্ত্রের আর একটা অধিকতর ব্যবহারিক অথচ কম সুসংবদ্ধ রূপ আছে; তাতে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে শ্রমিক শ্রেণীর চোখে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এই বলে যে নিছক রাজনৈতিক কোনো সংস্কারে নয়, অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থার, অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তনেই তাদের সুবিধা হতে পারে। অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থার পরিবর্তন বলতে অবশ্য এই ধরনের সমাজতন্ত্র কোনোক্রমেই বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কের উচ্ছেদ বোঝে না, যে উচ্ছেদ কেবল বিপ্লব দিয়েই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব; বোঝে বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে শুধু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। অর্থাৎ এহেন সংস্কার যা পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের সম্পর্কটাকে কোনো দিক

থেকেই আঘাত করে না, শুধু বড়ো জোর বুর্জোয়া সরকারের প্রশাসনের খরচ কমায় ও তাকে সরল করে আনে।

বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের সর্বোত্তম প্রকাশ শুধু তখন, যখন তা একটা বাক্যালঙ্কার মাত্র।

অবাধ বাণিজ্য: শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্য। সংরক্ষণ শুল্ক: শ্রমিক শ্রেণীরই উপকারের জন্য। কারাগারের সংস্কার: শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্য। বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের এই হল শেষ ও একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কথা।

সংক্ষেপে তা এই: বুর্জোয়ারা শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্যই বুর্জোয়া।

৩। সমালোচনী-ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম

আধুনিক যুগের প্রতিটি বড় বড় বিপ্লবে যে সাহিত্য প্রলেতারিয়েতের দাবিকে ভাষা দিয়েছে, যেমন বাব্যেফ ও অন্যান্যদের রচনা, আমরা এখানে তার উল্লেখ করছি না।

সামন্ত সমাজ যখন উচ্ছেদ হচ্ছে তখনকার সার্বজনীন উত্তেজনার কালে নিজেদের লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য প্রলেতারিয়েতের প্রথম সাক্ষাৎ প্রচেষ্টাগুলি অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হয়, কারণ প্রলেতারিয়েত তখন পর্যন্ত সুবিকশিত হয় নি, তার মুক্তির অনুকূল অর্থনৈতিক অবস্থাও তখন অনুপস্থিত। তেমন অবস্থা গড়ে উঠতে তখনও বাকি, আসন্ন বুর্জোয়া যুগেই কেবল তা গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল। প্রলেতারিয়েতের এই প্রথম অভিযানসমূহের সঙ্গী ছিল যে বিপ্লবী সাহিত্য তার প্রতিক্রিয়াশীল একটা চরিত্র থাকা ছিল অনিবার্য। সে সাহিত্য প্রচার করত সর্বব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধন, স্থূল ধরনের সামাজিক সমতা।

প্রকৃতপক্ষে যাকে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট মতাদর্শ বলা চলে, অর্থাৎ সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েন ইত্যাদির মতবাদ, জন্ম নিল প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়ার সংগ্রামের সেই অপরিণত যুগে, যার বর্ণনা আগে দেওয়া হয়েছে (প্রথম অধ্যায় 'বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত' দ্রষ্টব্য)।

এই জাতীয় মতের প্রতিষ্ঠাতারা শ্রেণী-বিরোধ এবং প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিধ্বংসী উপাদানগুলির ক্রিয়াটা দেখেছিলেন। কিন্তু প্রলেতারিয়েত তখনও তার শৈশবে; এ'দের চোখে বোধ হল সে শ্রেণীর নিজস্ব ঐতিহাসিক উদ্যম এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন নেই।

শ্রেণী-বিরোধ বাড়ে যন্ত্রশিল্প প্রসারের সঙ্গে সমান তালে; সেদিনের অর্থনৈতিক অবস্থা তাই তখনো এঁদের সামনে প্রলেতারিয়েতের মুক্তির বৈষয়িক শর্তগুলি তুলে ধরে নি। সুতরাং এঁরা খুঁজতে লাগলেন সে শর্ত সৃষ্টি করার মতো নতুন সমাজবিজ্ঞান, নতুন সামাজিক নিয়ম।

তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্ভাবন-ক্রিয়াকে আনতে হল ঐতিহাসিক ক্রিয়ার স্থানে। মুক্তির ইতিহাস-সৃষ্ট শর্তের বদলে কল্পিত শর্ত, প্রলেতারিয়েতের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রেণী-সংগঠনের বদলে উদ্ভাবকদের নিজেদের বানানো এক সমাজ-সংগঠন। তাদের কাছে মনে হল ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাঁদেরই সামাজিক পরিকল্পনার প্রচার ও বাস্তব রূপায়ণ।

পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় সর্বাধিক নিগৃহীত শ্রেণী হিসাবে প্রধানত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার চেতনা তাঁদের ছিল। তাঁদের কাছে প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বই ছিল কেবল সর্বাধিক নিগৃহীত শ্রেণী হিসাবে।

শ্রেণী-সংগ্রামের অপরিণত অবস্থা এবং তাঁদের স্বকীয় পরিবেশের দরুন এই ধরনের সমাজতন্ত্রীরা মনে করতেন যে তাঁরা সকল শ্রেণী-বিরোধের বহু ঊর্ধ্বে। তাঁরা চেয়েছিলেন সমাজের প্রত্যেক সদস্যের, এমন কি সবচেয়ে সুবিধাভোগীর অবস্থাও উন্নত করতে। সেইজন্য সাধারণত শ্রেণীনির্বিশেষে গোটা সমাজের কাছে আবেদন জানানো; এমন কি তুলনায় শাসক শ্রেণীর কাছেই আবেদন-নিবেদন ছিল এঁদের পছন্দ। কেননা, এঁদের ব্যবস্থাটা একবার বুঝতে পারলে লোকে কেমন করে না দেখে পারবে যে এইটাই সমাজের সর্বোত্তম-সম্ভব ব্যবস্থার জন্য সর্বোত্তম-সম্ভব পরিকল্পনা?

সেইজন্য সকল রাজনৈতিক, বিশেষত সকল বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে এঁরা বর্জন করলেন; এঁদের অভিলাষ হল শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধন; চেষ্টা হল দৃষ্টান্তের জোরে, এবং যার ভাগ্যে ব্যর্থতাই অনিবার্য এমন ছোটখাট পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন সামাজিক বেদের (Gospel) পথ কাটতে।

ভবিষ্যৎ সমাজের এ ধরনের উদ্ভট ছবি আঁকা হয় এমন সময়ে যখন প্রলেতারিয়েত অতি অপরিণত অবস্থার মধ্যে ছিল, নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে তাদের ধারণাও ছিল উদ্ভট; সমাজের ব্যাপক পুনর্গঠন সম্বন্ধে এ শ্রেণীর প্রাথমিক স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এ ধরনের ছবির মিল দেখা যায়।

কিন্তু সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট এই সব লেখার মধ্যে সমালোচনামূলক একটা দিকও আছে। বর্তমান সমাজের প্রত্যেকটি নীতিকে এরা আক্রমণ

করল। তাই শ্রমিক শ্রেণীর জ্ঞানলাভের পক্ষে অনেক অমূল্য তথ্যে তা পরিপূর্ণ। শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে প্রভেদ, পরিবার প্রথা, ব্যক্তিবিশেষের লাভের জন্য শিল্প পরিচালনা ও মজুরি-শ্রমের উচ্ছেদ, সামাজিক সৌষম্য ঘোষণা, রাষ্ট্রের কাজকে কেবলমাত্র উৎপাদনের তদারকে রূপান্তরিত করণ ইত্যাদি যেসব ব্যবহারিক প্রস্তাব এই লেখার মধ্যে আছে তাদের সবকটাই শ্রেণী-বিরোধের অন্তর্ধানের দিকেই কেবল অঙ্গুলি নির্দেশ করে, অথচ সে বিরোধ সেদিন সবেমাত্র মাথা তুলছিল, এই সব লেখার মধ্যে ধরা পড়েছিল তাদের আদি অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট রূপটুকু। প্রস্তাবগুলির প্রকৃতি তাই নিতান্তই ইউটোপীয়।

সমালোচনামূলক-ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের যা তাৎপর্য তার সঙ্গে ঐতিহাসিক বিকাশের সম্বন্ধটা বিপরীতমুখী। আধুনিক শ্রেণী-সংগ্রাম যতই বিকশিত হয়ে সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে থাকে, ঠিক ততই এই উদ্ভট সংগ্রাম-পরিহারের, শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে এইসব উদ্ভট আক্রমণের সকল ব্যবহারিক মূল্য ও তাত্ত্বিক যুক্তি হারায়। সেইজন্যই, এই সমস্ত মতবাদের প্রবর্তকেরা অনেক দিক দিয়ে বিপ্লবী হলেও তাঁদের শিষ্যরা প্রতিক্ষেত্রে কেবল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীতেই পরিণত হয়েছে। প্রলেতারিয়েতের প্রগতিশীল ঐতিহাসিক বিকাশের বিপরীতে তারা নিজ নিজ গুরুর আদি মতগুলিকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তাই তাদের অবিচল চেষ্টা যেন শ্রেণী-সংগ্রাম নিস্তেজ হয়ে পড়ে, যেন শ্রেণী-বিরোধ আপসে মিটে যায়। তারা এখনও তাদের সামাজিক ইউটোপিয়ার পরীক্ষামূলক রূপায়ণের স্বপ্ন দেখে; বিচ্ছিন্ন 'ফালানস্টের' প্রতিষ্ঠা, 'হোম কলোনি' স্থাপন, 'ছোট আইকেরিয়া'* প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখে, নব জেরুজালেমের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে, — আর এই আকাশকুসুম বাস্তব করার জন্য আবেদন জানায়

---

* 'ফালানস্টের' (phalanstères) হল ফুরিয়ের কল্পিত সমাজতন্ত্রী উপনিবেশ; কাবে তাঁর ইউটোপিয়া এবং পরবর্তী আমেরিকাস্থিত কমিউনিস্ট উপনিবেশকে আইকেরিয়া নাম দেন। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

ওয়েন তাঁর আদর্শ কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলিকে 'হোম কলোনি' বলতেন; ফুরিয়ের কল্পিত সর্বভোগ্য প্রাসাদের নাম 'ফালানস্টের'। যে ইউটোপীয় কল্পরাজ্যের কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠান কাবে বর্ণনা করেছিলেন, তারই নাম 'আইকেরিয়া'। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

বুর্জোয়া শ্রেণীর সহানুভূতি ও টাকার থলির কাছে। আগে যে প্রতিক্রিয়াপন্থী বা রক্ষণশীল সমাজতন্ত্রীদের বর্ণনা করা হয়েছে এরা ধীরে ধীরে নেমে যায় সেই স্তরে; তফাৎ শুধু তাদের আরও প্রণালীবদ্ধ পাণ্ডিত্যে, এবং সমাজবিদ্যার অলৌকিক মাহাত্ম্যে অন্ধ ও সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসে।

শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত রাজনৈতিক প্রচেষ্টার এরা তাই তীব্র বিরোধী, এদের মতে সে প্রচেষ্টা কেবলমাত্র নব বেদে অন্ধ অবিশ্বাসের ফল।

ইংলণ্ডে ওয়েনপন্থীরা এবং ফ্রান্সে ফুরিয়েভক্তরা যথাক্রমে চার্টিস্ট ও সংস্কারবাদীদের (৭) বিরোধী।

৪

বর্তমান নানা সরকার-বিরোধী পার্টির সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধ

শ্রমিক শ্রেণীর যে সব পার্টি এখন বিদ্যমান, যেমন ইংলণ্ডে চার্টিস্টগণ ও আমেরিকায় কৃষি সংস্কারবাদীরা, তাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরিষ্কার করা হয়েছে।

উপস্থিত লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর সাময়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য কমিউনিস্টরা লড়াই করে থাকে, কিন্তু আন্দোলনের বর্তমানের মধ্যেও তারা আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি, তার রক্ষক। ফ্রান্সে রক্ষণশীল এবং র‍্যাডিকাল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তারা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের* সঙ্গে হাত মেলায়, কিন্তু মহান ফরাসী বিপ্লব থেকে ঐতিহ্য হিসাবে যে সব বাঁধা বুলি ও ভ্রান্তি চলে আসছে তার সমালোচনার অধিকারটুকু বর্জন না করে।

সুইজারল্যাণ্ডে সমর্থন করা হয় র‍্যাডিকালদের, কিন্তু এ সত্য ভোলা হয়

---

* পার্লামেণ্টে এই পার্টির প্রতিনিধিত্ব করতেন লেদ্রু-রলাঁ, সাহিত্য ক্ষেত্রে লুই ব্লাঁ, দৈনিক সংবাদপত্র জাতে *Réforme* পত্রিকা। সোশ্যালিস্ট-ডেমোক্রাট নামের উদ্ভাবকদের কাছে নামটির অর্থ ছিল গণতন্ত্রী বা প্রজাতন্ত্রী দলের একাংশ, যার মধ্যে সমাজতন্ত্রের কমবেশি রং লেগেছে। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

এই সময় ফ্রান্সে যে পার্টি নিজেকে সোশ্যালিস্ট-ডেমোক্রাট বলত, তাদের রাজনৈতিক জীবনে প্রতিনিধি ছিলেন লেদ্রু-রলাঁ আর সাহিত্য জগতে লুই ব্লাঁ, সুতরাং আজকের দিনের জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সঙ্গে এর ছিল দুস্তর পার্থক্য। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

না যে এ দলটি পরস্পরবিরোধী উপাদানে গঠিত, এদের খানিকটা ফরাসী অর্থে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী আবার খানিকটা হল র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া।

পোল্যাণ্ডে তারা সেই দলটিকে সমর্থন করে যারা জাতীয় মুক্তির প্রাথমিক শর্ত হিসাবে কৃষি বিপ্লবের ওপর জোর দেয়, সেই দল যারা ১৮৪৬ সালের ক্রাকোভ বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়েছিল।

জার্মানিতে বুর্জোয়ারা যখন বিপ্লবী অভিযান করে তখনই কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে একত্রে লড়ে নিরংকুশ রাজতন্ত্র, সামন্ত জমিদারতন্ত্র এবং পেটি বুর্জোয়ার* বিরুদ্ধে।

কিন্তু বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে বৈর বিরোধ বর্তমান তার যথাসম্ভব স্পষ্ট স্বীকৃতিটা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চার করার কাজ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যও বিরত হয় না; এইজন্য যাতে, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আসতে বাধ্য, জার্মান মজুরেরা যেন তৎক্ষণাৎ তাকেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে; এইজন্যই যাতে, জার্মানিতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির পতনের পর যেন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেই অবিলম্বে লড়াই শুরু হতে পারে।

কমিউনিস্টরা প্রধানত জার্মানির দিকে মন দিচ্ছে কারণ সে দেশে একটি বুর্জোয়া বিপ্লব আসন্ন, ইউরোপীয় সভ্যতার অধিকতর অগ্রসর পরিস্থিতির মধ্যে তা ঘটতে বাধ্য, এবং ঘটবে সতেরো শতকের ইংলণ্ড ও আঠারো শতকের ফ্রান্সের তুলনায় অনেক বিকশিত এক প্রলেতারিয়েত নিয়ে। এবং এই কারণে যে, জার্মানির বুর্জোয়া বিপ্লব হবে অব্যবহিত পরবর্তী প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভূমিকা মাত্র।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, কমিউনিস্টরা সর্বত্রই বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলন সমর্থন করে।

এই সব আন্দোলনেই তারা প্রত্যেকটির প্রধান প্রশ্ন হিসাবে সামনে এনে ধরে মালিকানার প্রশ্ন, তার বিকাশের মাত্রা তখন যাই থাক না কেন।

শেষ কথা, সকল দেশের গণতন্ত্রী পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্য ও বোঝাপড়ার জন্য তারা সর্বত্র কাজ করে।

---

* মূল জার্মানে Kleinbürgerei। মার্কস ও এঙ্গেলস কথাটা ব্যবহার করেছিলেন শহরবাসী পেটি বুর্জোয়ার প্রতিক্রিয়াশীল অংশগুলির অর্থে। — সম্পাঃ

আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিস্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে কেবল সমস্ত প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সবল উচ্ছেদ মারফত। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণীরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। জয় করবার জন্য আছে সারা জগৎ।

দুনিয়ার মজুর এক হও!

ডিসেম্বর, ১৮৪৭ থেকে
জানুয়ারি, ১৮৪৮-এর মধ্যে
মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮ সালে
লন্ডনে প্রথম প্রকাশিত

টীকা

(১) 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের মহত্তম কর্মসূচি-দলিল। 'এই ছোট পুস্তিকাখানি একাই বহু বৃহৎ গ্রন্থের সমতুল্য। সভ্য জগতের সমগ্র সংগঠিত ও সংগ্রামী প্রলেতারিয়েত আজো তার প্রেরণায় উদ্দীপিত ও অগ্রসর' (লেনিন)। 'কমিউনিস্ট লীগের' কর্মসূচি হিসাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখা এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় লন্ডনে, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে, ২৩ পাতার একটি পৃথক পুস্তিকাকারে। ১৮৪৮ সালের মার্চ-জুলাই মাসে জার্মান রাজনৈতিক দেশান্তরীদের গণতান্ত্রিক মুখপত্র, *Deutsche Londoner Zeitung*-এ এটি কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। সেই বছরেই জার্মান মূল পাঠটি লন্ডনে ৩০ পাতার একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়, তাতে প্রথম সংস্করণের ছাপার ভুলভ্রান্তি সংশোধন ও যতিচিহ্নাদির প্রয়োগ উন্নত করা হয়। পরবর্তী প্রামাণ্য সংস্করণাদির ভিত্তি হিসাবে এই সংস্করণের পাঠটিই মার্কস ও এঙ্গেলস ব্যবহার করেন। ১৮৪৮ সালে একাধিক ইউরোপীয় ভাষাতেও (ফরাসী, পোলীয়, ইতালীয়, ডেনিশ, ফ্লেমিশ ও সুইডীয়) 'ইশতেহারের' অনুবাদ হয়। ১৮৪৮ সালের সংস্করণগুলিতে রচয়িতাদের নাম ছিল না। এ নাম প্রথম ছাপা হয় ১৮৫০ সালে, 'ইশতেহারের' প্রথম ইংরেজী অনুবাদ তখন প্রকাশিত হয় চার্টিস্ট পত্রিকা *Red Republican*-এ, তার ভূমিকায় পত্রিকার সম্পাদক জর্জ জুলিয়ান হার্নি তাঁদের নামোল্লেখ করেন।

১৮৭২ সালে কিছু সংশোধন এবং মার্কস ও এঙ্গেলস লিখিত একটা ভূমিকা সহ নতুন একটি জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণটি এবং ১৮৮৩ ও ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের নাম ছিল 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'।

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের' প্রথম রুশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে, জেনেভায়; অনুবাদ করেছিলেন বাকুনিন, কয়েকটি অনুচ্ছেদে মূল পাঠের বিকৃতি ঘটে। এই প্রথম রুশ সংস্করণের গলদ দূর হয় ১৮৮২ সালে জেনেভা থেকে প্রকাশিত প্লেখানভের অনুবাদে। রাশিয়ায় 'ইশতেহারের' বক্তব্য ছড়ানোয় প্লেখানভের অনুবাদ বহু কাজ দেয়। রাশিয়ায় মার্কসবাদের প্রচারে বিপুল গুরুত্ব

দেন মার্কস ও এঙ্গেলস এবং ১৮৮২ সালের সংস্করণের জন্য একটি বিশেষ ভূমিকা লেখেন।

মার্কসের মৃত্যুর পর 'ইশতেহারের' অনেকগুলি সংস্করণ এঙ্গেলস দেখে দিয়েছিলেন: তাঁর ভূমিকা সহ ১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণ, স্যামুয়েল মুর অনুদিত ১৮৮৮ সালের একটি ইংরেজী সংস্করণ, এঙ্গেলস তার সম্পাদনা করেন এবং একটি ভূমিকা ও কতকগুলি টীকা যোগ করেন; এবং ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণ, তাতে এঙ্গেলস নতুন একটি ভূমিকা লেখেন ও এই সর্বশেষ সংস্করণটির জন্য কিছু টীকাও যোগ করেন। মার্কসের দুহিতা লোরা লাফার্গ কৃত 'ইশতেহারের' একটি ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয় *Socialiste* পত্রিকায়, ১৮৮৫ সালে, এঙ্গেলস এটি দেখে দিয়েছিলেন। ১৮৯২ সালের পোলীয় সংস্করণ ও ১৮৯৩ সালের ইতালীয় সংস্করণেও ভূমিকা লেখেন এঙ্গেলস। পৃঃ ২

(২) **'কমিউনিস্ট লীগ'** — প্রলেতারিয়েতের প্রথম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন। এটি প্রতিষ্ঠার আগে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রী ও অগ্রণী শ্রমিকদের মতাদর্শ ও সংগঠনের দিক থেকে জমায়েত করার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসকে প্রচুর খাটতে হয়েছিল। এই লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা ১৮৪৬ সালেই ব্রাসেলসে কমিউনিস্ট করেসপণ্ডেন্স কমিটি গঠন করেন। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠায় মার্কস ও এঙ্গেলস তীব্র বিতর্ক চালান ভাইতলিং-এর স্থূল সমবাদী কমিউনিজমের বিরুদ্ধে, 'খাঁটি সমাজতন্ত্র' এবং প্রুধোঁর পেটি বুর্জোয়া ইউটোপিয়ার বিরুদ্ধে, — শ্রমিক ও কারিগর নিয়ে গঠিত গুপ্ত সমিতি 'ন্যায় লীগের' সদস্যদের ওপর প্রুধোঁর প্রভাব ছিল। জার্মানি, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও ইংলন্ডে সংগঠন ছিল এ লীগের। 'ন্যায় লীগের' লন্ডন নেতৃত্ব মার্কস ও এঙ্গেলসের ভাবাদর্শের সঠিকতায় নিশ্চিত হয়ে ১৮৪৭ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে আমন্ত্রণ জানান তাঁদের সংগঠনে যোগ দিতে ও তাঁদের প্রদত্ত নীতির ভিত্তিতে লীগের একটি কর্মসূচি প্রণয়ন ও লীগের পুনঃসংগঠনে অংশ নিতে। মার্কস ও এঙ্গেলস আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

'ন্যায় লীগের' কংগ্রেস হয় ১৮৪৭ সালের জুন মাসের গোড়ার দিকে, লন্ডনে। 'কমিউনিস্ট লীগের' প্রথম কংগ্রেস বলে এটি ইতিহাসে খ্যাত। এঙ্গেলস ও ভিলহেলম ভল্‌ফ কংগ্রেসের কাজকর্মে অংশ নেন। কংগ্রেসে 'ন্যায় লীগের' পুনর্নামকরণ হয় 'কমিউনিস্ট লীগ' এবং 'সব মানুষই ভাই' এই পুরনো ঝাপসা স্লোগানের বদলে দেওয়া হয় প্রলেতারীয় পার্টির সংগ্রামী আন্তর্জাতিক ধ্বনি: 'দুনিয়ার মজুর এক হও!' কংগ্রেসে 'কমিউনিস্ট লীগের নিয়মাবলী'ও বিচার করা হয় — এটির রচনায় সক্রিয় সাহায্য করেন এঙ্গেলস। নতুন নিয়মাবলীতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলি পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট হয় ও যেসব শর্তে সংগঠনটির চেহারা দাঁড়িয়েছিল গুপ্ত সমিতির মতো, তা বর্জন করা হয়, লীগের কাঠামো গড়া হয় গণতান্ত্রিক নীতির ওপর। নিয়মাবলী চূড়ান্তরূপে অনুমোদিত হয় কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেসে।

এ কংগ্রেস হয় ১৮৪৭ সালের ২৯শে নভেম্বর — ৮ই ডিসেম্বর, লণ্ডনে, এবং মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনেই তাতে অংশ নেন। সুদীর্ঘ বিতর্কে তাঁরা বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নীতিগুলিকে রক্ষা করেন ও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস তা সর্ববাদীসম্মতরূপে গ্রহণ করে। কংগ্রেসের অনুরোধে মার্কস ও এঙ্গেলস লেখেন 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' — এই দলিল-কর্মসূচিটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে।

লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ছিল লণ্ডনে; ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হওয়ায় ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে কেন্দ্রীয় কমিটি তার নেতৃত্ব তুলে দেয় ব্রাসেল্‌স্‌ জেলা কমিটির হাতে, যার নেতৃত্বে ছিলেন মার্কস। মার্কস ব্রাসেল্‌স্‌ থেকে নির্বাসিত হয়ে প্যারিসে আসায় নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিও মার্চের গোড়ার দিকে ফরাসী রাজধানীতে স্থানান্তরিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটিতে এঙ্গেলসও নির্বাচিত হন। ১৮৪৮ সালের মার্চের শেষ ও এপ্রিলের গোড়ায় কেন্দ্রীয় কমিটি কয়েক শত জার্মান শ্রমিককে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। এদের অধিকাংশই 'কমিউনিস্ট লীগের' সভ্য। জার্মানিতে তখন যে বিপ্লব শুরু হয়েছিল তাতে এরা অংশ নেবে স্থির হয়। এ বিপ্লবে 'কমিউনিস্ট লীগের' কর্মসূচি দেওয়া হয় 'জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির দাবি'তে মার্চের শেষের দিকে। মার্কস ও এঙ্গেলস তা রচনা করেন।

১৮৪৮ সালের এপ্রিলের গোড়ায় জার্মানিতে এসে মার্কস ও এঙ্গেলস এবং তাঁদের অনুগামীরা বোঝেন যে পশ্চাৎপদ জার্মানিতে যেখানে শ্রমিকদের ঐক্য নেই, রাজনৈতিক সচেতনতা কম, সেখানে সারা দেশে ছড়ানো 'কমিউনিস্ট লীগের' শ দুই-তিন সদস্য জনগণকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারবে না। তাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চরম বামপন্থী, বস্তুত প্রলেতারীয় অংশটার সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন। কলোন গণতান্ত্রিক সমিতিতে যোগ দেন তাঁরা এবং বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের মত তুলে ধরার জন্য, পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের অসঙ্গতি ও দোদুল্যমানতা সমালোচনা এবং তাদের সংগ্রামে প্ররোচিত করার জন্য গণতান্ত্রিক গ্রুপগুলিতে যোগ দিতে তাঁরা অনুগামীদের পরামর্শ দেন। সেইসঙ্গে শ্রমিক সমিতি সংগঠন, প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক শিক্ষার ওপর মনোনিবেশ এবং একটা গণ প্রলেতারীয় পার্টির ভিত্তি গড়ার জন্যও মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের তাগিদ দেন। 'কমিউনিস্ট লীগের' সদস্যদের পরিচালক কেন্দ্র ছিল মার্কস সম্পাদিত *Neue Rheinische Zeitung* পত্রিকা। ১৮৪৮ সালের শেষ দিকে লণ্ডনে লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করে ও লীগ পুনর্গঠনের জন্য জসেফ মলকে জার্মানিতে পাঠায় দূত হিসাবে। লণ্ডন সংস্থাটি ইতিমধ্যে ১৮৪৭ সালের নিয়মাবলী সংশোধন করে তাদের রাজনৈতিক তাৎপর্য কমিয়ে ফেলে। 'কমিউনিস্ট লীগের' প্রধান লক্ষ্য হিসাবে বুর্জোয়ার উচ্ছেদ, প্রলেতারীয় শাসন প্রতিষ্ঠা ও শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের কথা আর তাতে ছিল না। তার বদলে বলা

হয় কেবল একটা সামাজিক প্রজাতন্ত্রের কথা। ১৮৪৮ — ১৮৪৯ সালের শীতে মল-এর দৌত্য ব্যর্থ হয়।

১৮৪৯ সালের এপ্রিলে মার্কস, এঙ্গেলস ও তাঁদের অনুগামীরা গণতান্ত্রিক সমিতি ত্যাগ করেন। শ্রমিক জনগণ তখন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ও পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের ওপর ভয়ানক আস্থা হারিয়েছে, তাই একটা স্বাধীন প্রলেতারীয় পার্টি স্থাপনের কথা ভাবার সময় এসেছিল তখন। কিন্তু পরিকল্পনা কার্যকরী করতে ব্যর্থ হন মার্কস ও এঙ্গেলস। দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানিতে একটা অভ্যুত্থান ঘটে ও তার পরাজয়ে জার্মান বিপ্লবের অবসান হয়।

বিপ্লবের ঘটনাধারা থেকে বোঝা যায় যে 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল 'কমিউনিস্ট লীগের' সেসব মতামতই একান্ত সঠিক, বিপ্লবী কৌশলের একটা চমৎকার স্কুল হিসাবে কাজ করে লীগ। তার সদস্যেরা সতেজে অংশ নেয় আন্দোলনে, সর্বাধিক বিপ্লবী শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে যায় সংবাদপত্রে, ব্যারিকেডে, যুদ্ধক্ষেত্রে।

বিপ্লবের পরাজয়ে কঠিন ঘা খায় 'কমিউনিস্ট লীগ'। তার বহু সদস্য কারারুদ্ধ হয়, নয় দেশত্যাগ করে। ঠিকানা-পত্র যোগাযোগ সব নষ্ট হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় স্থানীয় শাখাগুলির কাজ। জার্মানির বাইরেও প্রচুর ক্ষতি সইতে হয় লীগকে।

১৮৪৯ সালের শরতে লীগের অধিকাংশ নেতা লন্ডনে সমবেত হন। মার্কস ও এঙ্গেলসের নেতৃত্বাধীন পুনর্গঠিত নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচেষ্টার দৌলতে পূর্বের সংগঠন পুনরুদ্ধার হয় ও লীগের কাজকর্ম ফের শুরু হয় ১৮৫০ সালের বসন্তে। ১৮৫০ সালের মার্চে মার্কস ও এঙ্গেলস লেখেন 'কমিউনিস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্য'। এতে ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবের ফলাফল নির্ণয় করা হয় ও পেটি বুর্জোয়াদের কাছ থেকে স্বাধীন একটি প্রলেতারীয় পার্টি গঠনের কর্তব্য হাজির করা হয়। 'বক্তব্যে'ই প্রথম চিরস্থায়ী বিপ্লবের ভাবনা নির্দিষ্ট হয়। ১৮৫০ সালের মার্চে নতুন একটি কমিউনিস্ট মুখপত্র প্রকাশিত হয়। এটি হল *Neue Rheinische Zeitung, Politisch-ōkonomische Rèvue*।

১৮৫০ সালের গ্রীষ্মে রণকৌশল নিয়ে 'কমিউনিস্ট লীগের' কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে একটি নীতিগত বিতর্ক দেখা দেয়। আগস্ট ভিল্লিখ ও কার্ল শাপার ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ বিকাশ ও বাস্তবতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অবিলম্বে একটা বিপ্লব বাধাবার সংকীর্ণপন্থী ও বেপরোয়া কর্মনীতির প্রস্তাব করে। মার্কস ও এঙ্গেলসের নেতৃত্বে অধিকাংশ তার সুদৃঢ় বিরোধিতা করে। মার্কস ও এঙ্গেলস প্রধান জোর দেন বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রচারে ও আসন্ন বিপ্লবী সংঘাতের জন্য প্রলেতারীয় বিপ্লবীদের তৈরি করে তোলায়। তাঁরা বলেন, প্রতিক্রিয়াশীলরা যখন আক্রমণ শুরু করেছে তখনকার কালে 'কমিউনিস্ট লীগের' প্রধান কর্তব্য হল

এইটে। ১৮৫০ সালের মধ্য সেপ্টেম্বরে ভিল্লিখ-শাপারের বিভেদপন্থী ক্রিয়াকলাপের ফলে তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ১৫ই সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে মার্কসের পরামর্শমতো কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষমতা কলোন জেলা কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। লণ্ডন কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠের এই মত জার্মানিতে সর্বত্র 'কমিউনিস্ট লীগের' শাখাগুলি অনুমোদন করে। মার্কস ও এঙ্গেলসের নির্দেশে কলোনে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ১৮৫০ সালের ডিসেম্বরে নতুন একদফা লীগ নিয়মাবলী রচনা করে। ১৮৫১ সালের মে মাসে পুলিসী নির্যাতন ও গ্রেপ্তারের ফলে জার্মানিতে 'কমিউনিস্ট লীগের' কার্যকলাপ বস্তুতপক্ষে থেমে যায়। কলোন কমিউনিস্ট বিচারের অনতিপরেই মার্কস 'কমিউনিস্ট লীগ' তুলে দেবার কথা ঘোষণা করতে বলেন। সে ঘোষণা করা হয় ১৮৫২ সালের ১৭ই নভেম্বরে।

প্রলেতারীয় বিপ্লবীদের একটা স্কুল হিসাবে, প্রলেতারীয় পার্টির একটা বীজকেন্দ্র হিসাবে, এবং প্রথম আন্তর্জাতিক — শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির পূর্বসূরী হিসাবে 'কমিউনিস্ট লীগ' তার ঐতিহাসিক কর্তব্য করে গেছে। পৃঃ ৭

(৩) **'কলোকোল'** (ঘণ্টা) — "Vivos voco!" (জীবিতদের ডাক দিই!) এই আদর্শবাণী নিয়ে রুশ ভাষায় প্রকাশিত একটি রাজনৈতিক পত্রিকা। প্রকাশক ছিলেন আ. ই. গের্ৎসেন ও ন. প. ওগারিওভ। গের্ৎসেন প্রতিষ্ঠিত লণ্ডনে মুক্ত রুশ প্রেস থেকে এটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এবং জেনেভায় ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৮৬৮ সালে পত্রিকাটি রুশ ক্রোড়পত্র সহ ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়।

'গের্ৎসেনের স্মৃতিতে' লেনিনের এই প্রবন্ধে 'কলোকোলের' প্রসঙ্গ আছে। পৃঃ ৯

(৪) এ টীকাটি এঙ্গেলস 'ইশতেহারের' ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণেও অন্তর্ভুক্ত করেন কিন্তু শেষ বাক্যটি তুলে দেন। পৃঃ ৩২

(৫) 'শ্রমের মূল্য' ও 'শ্রমের দাম', এর পরিবর্তে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের পরবর্তী রচনায় 'শ্রমশক্তির মূল্য' ও 'শ্রমশক্তির দাম' মার্কস প্রবর্তিত এই অধিকতর সঠিক কথা ব্যবহার করেন। পৃঃ ৪০

(৬) **ফরাসী লেজিটিমিস্ট** — ১৮৩০ সালে যে বুরবোঁ রাজবংশের পতন ঘটে তাদের পক্ষপাতী, ভূস্বামী অভিজাতদের স্বার্থের প্রতিনিধি এরা। তদানীন্তন শাসক ছিল অর্লিয়োঁ বংশ, এদের সমর্থন করত অর্থপতি অভিজাত ও বৃহৎ বুর্জোয়ারা। তার বিরোধিতা করে কিছু কিছু লেজিটিমিস্ট সামাজিক বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নিত, বুর্জোয়া শোষণের বিরুদ্ধে মেহনতীদের স্বার্থরক্ষার ভেক ধারণ করত।

'নবীন ইংলণ্ড' — টোরি রাজনৈতিক ও সাহিত্যিকদের একটি গ্রুপ। এটি গঠিত হয় উনিশ শতকের পঞ্চম দশকের গোড়ায়। বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে ভূস্বামী অভিজাততন্ত্রের অসন্তোষ প্রকাশ পেত এদের মধ্যে; শ্রমিক শ্রেণীর উপর প্রভাব বিস্তার করে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের ব্যবহার করার জন্য এরা বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নিত।

এই গ্রুপটির মতবাদকে মার্কস ও এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে' সামন্ত সমাজতন্ত্র বলে বর্ণনা করেছেন। পৃঃ ৫৯

(৭) *Réforme* পত্রিকার অনুগামীদের কথা বলা হচ্ছে, এরা প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক ও সামাজিক সংস্কারের প্রচার করত।

La Réforme — ফরাসী দৈনিক সংবাদপত্র, পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের মুখপত্র। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত। ১৮৪৭ সালের অক্টোবর ও ১৮৪৮ সালের জানুয়ারির মধ্যে এঙ্গেলস এ পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। পৃঃ ৬৯

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

Подписано к печати 22/VI-70 г. Формат 84×108$^{1}/_{32}$.
Бум. л. 1$^{1}/_{4}$. Печ. л. 4,2+3 вкл. Уч.-изд. л., 4.93.
Заказ № 1818. Цена 15 к. Тираж 40 000

Издательство «Прогресс»
Комитета по печати при Совете Министров СССР
Москва Г-21, Зубовский бульвар, 21.

Калининский полиграфкомбинат Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Калинин, проспект Ленина, 5.